যাচ্ছিলে, সেটা খুব witty, কিন্তু আমাকে বাধা দিলে আমি গুছিয়ে বলতে পারবো না। সুতরাং, আপাতত মন দিয়ে শোনো। জ্যাম? এই যে।

'মাস ছয় হ'লো একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে—তোমরা বোধহয় তাকে আগে থেকেই চিনতে—শর্বরী রায়। অমিতা চন্দর এক পার্টিতে ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। তোমাদের বলা বাহুল্য যে ১৯২৬ সন থেকে যে-মাজিত উচ্ছৃঙ্খলতা দেশের কলচর্ড মহলের ফ্যাশান হয়েছে, তা আমাকে কখনোই আকর্ষণ করেনি। তোমার সঙ্গে মতদ্বৈধ হবে, বিভূতি, কিন্তু আমার কাছে সব মেয়েই—কী বলা যায়?—সব মেয়েই স্ত্রীলোক নয়।

'কিন্তু শর্বরী রায়ের অন্ধকার চুল দেখে আমার অমাবস্যার অজস্র তারার কথা মনে প'ড়ে গেলো। কৃষ্ণকেশী শর্বরীকে প্রথম যখন দেখলাম, সেই কালো চুলের ঘন অরণ্য ছাড়া আর-কিছুই দেখতে পেলাম না।

'পার্টি ভেঙে যাওয়ার পরও আমি ঘোরাফেরা করছি দেখে অমিতা—ফুরফুরে অমিতা—আমার কাছে এসে বললে, "শর্বরী রায় সম্বন্ধে আমি যা জানি, তা তোমাকে বললে কী দেবে?"

'আমি ওর হাত ধ'রে বললাম, "এখানে নয়। চলো বাইরে—লন-এ।"

'অমিতার সঙ্গে লন-এ আধ ঘণ্টা পায়চারি করার পর আমি বাড়ি ফিরলাম। সে-রাত্রে এই মধুর চিন্তা নিয়ে বিছানায় গেলাম যে শর্বরী রায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘনীভূত করবার একটা সুযোগ মিলেছে।

'সুযোগ হচ্ছে এই। ষোলো বছর বয়েসে—মানে, পাঁচ বছর আগে শর্বরী প্রথম প্রেমে পড়ে। ছেলেটি নিতান্তই উপন্যাসের নায়ক—ছবি-আঁকে-বাঁশি-বাজায় গোছের। নামও তেমনি—মলয়। চেহারাও সেই রকম, পাৎলা-লম্বা-ফর্শা-বড়ো-চুল। না, চেহারার কথা অমিতা বলেনি; আমি ওকে—মলয়কে—চিনতাম। আরো চা, সুকুমার?

'অমিতা বললো, ওদের সেই প্রেম বছরখানেক ছিলো। তারপর—তারপর কী যে হ'লো, অমিতা ঠিক বলতে পারলে না—কিছু-একটা হ'লো আরকি, যাতে প্রেম ভাঙলো। বোধহয় ঈর্ষা, ছেলেবয়সে ঈর্ষা যেমন কথায়-কথায় ফোঁশ করে ফণা তোলে, এমন আর কখনো না—কি হয়তো শর্বরী ওকে ছোটো ক'রে চুল ছাঁটতে অনুরোধ করেছিলো। সে যা-ই হোক, সেই বিচ্ছেদের পর মলয় একটা চাকরি নিয়ে আহমেদাবাদ

চ'লে যায়—তারপর তাকে আর নাকি কলকাতায় দেখা যায়নি।

'তারপর—অমিতা বললো—তারপর শর্বরীর জীবনেও আর কারো আবির্ভাব হয়নি। তুষ্টু, অমিতা আরো বললো, "সুতরাং এর পর তোমার পালা।"

'পরের দিন সকালে আমি টেলিফোনে শর্বরীকে ডাকলুম। হ্যাঁ, সাহস হ'লো। হবে না কেন? মলয়ের বন্ধু ব'লে নিজের পরিচয় দিতে ক'টা লোক পারে?

'আমার গলা শুনে আমাকে চিনতে পারলো না—পারবার কথাও নয়। বললাম, "বজ্রধর—বজ্রধর বসু আপনার সঙ্গে কথা বলছে। কালকে—"

' "হ্যাঁ, কালকেই আপনার সঙ্গে আলাপ হ'লো।' ইংরেজিতে ঐ কণ্ঠস্বরকে বলে icy।

'বরফের প্রভাবে জ'মে যাবার আগেই বললাম, "Excuse me—পরে অমিতার কাছে শুনলাম, মলয়ের সঙ্গে আপনার—ও কী?"

' "কিছু না। কী শুনলেন?"

' "না, মলয়কে আমি চিনতাম কিনা—ও আমার বন্ধু ছিলো, তাই—"

' "আপনি মলয়কে চিনতেন?"

'"চিনতাম ব'লেই আপনাকে বিরক্ত করলাম। আচ্ছা—"

'"না—না—এই একটু। আপনি দয়া ক'রে একবার আমার এখানে আসবেন? টেলিফোনে বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না। আসবেন?" আরো চা, বিভূতি?

'কালিঘাট ট্র্যাম-ডিপো ছাড়িয়ে গ্রীক গির্জার পুব দিকে ছোটো একতলা, লাল একটি বাড়ি চেনো, সুকুমার? সামনে ফুলের বাগান আছে। সেই বাড়িতে গেলাম—বিকেলে—সেইদিনই। সেই থেকে প্রায়ই যাচ্ছি। রোজই, বলতে পারো। আজ ছ'মাস হ'লো।

'সে-বাড়িতে থাকে শর্বরী আর তার ভাই;—ভাইটি বয়েসে বড়ো, কিন্তু দেখতে ছোটো মনে হয়। ভাইটিও খুব ইণ্টরেস্টিং, কিন্তু সম্প্রতি তার সঙ্গে মুখ-চেনা ক'রেই বিদায় নিতে হচ্ছে। পাখাটা খুলে দেবো?

'মলয়কে অবলম্বন ক'রে আলাপ আরম্ভ করলাম। জমলো। এমন জমলো যে সেদিন শর্বরীর জীবন-চরিত লেখবার মতো তথ্য নিয়ে ফিরে এলাম।

'মাসান্তে অপূর্ব আনন্দের সঙ্গে আবিষ্কার করা গেলো যে আমি শর্বরীর প্রেমে পড়েছি, এবং, আর যা-ই হোক, শর্বরীর আমাকে ভালো লাগে। বর্তমানে ব্যাপারটা

এতদূর গড়িয়েছে যে আমি ওকে বিয়ে করবার সংকল্প করেছি, কিন্তু কিছুতেই এ-কথা ওকে বলতে পারছি না।'

সুকুমার প্রশ্ন করলে, 'বাধা ?'

'বাধা মলয়। মলয়ের নামটা সিঁড়ির মতো ব্যবহার করবার উদ্দেশ্য আমার ছিলো; কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেই সিঁড়ি ছাড়িয়ে ওঠা আমার হবে না। মলয় আমাদের দু'জনকে পেয়ে বসেছে। বুঝতে পারছো ? এ-অবস্থায় এমন-কিছু আমি ভাবতে পারছি না, যা করলে নিষ্ঠুর বা কুৎসিত হবে না। সেইজন্যই তোমাদের পরামর্শ চাইছি। পাখাটা খুলেই দিই।

'হ্যাঁ, মলয়। আজও মলয়, কালও মলয়। মলয়কে ও ভুলেই গিয়েছিলো, কিন্তু আমি মলয়কে ফিরিয়ে এনেছি। শর্বরীর জীবনে ওর ষোলো বছরের প্রেম, ওর এক বছরের প্রেম, ওর প্রথম প্রেম ফিরে এসেছে। সেইজন্যই ওর কাছে আমার এত খাতির। আমিও সুবিধে পেয়ে ওর এই কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়েছি—মলয়ের সম্বন্ধে আমার স্বল্প অভিজ্ঞতাকে রং চড়িয়ে নানা ভাবে ওর কাছে উপস্থিত করেছি, ও আমাকে আবার আসতে বলবে, আমার জন্য অন্যান্য এনগেজমেণ্ট ভাঙবে, এই লোভে—যা বিশ্বাস করি না, তা-ই বলেছি—মলয়ের চোখ ছিলো শেলির মতো, ছবির চর্চা করলে ও ইণ্ডিয়ান আর্টের মোড়

ফেরাতে পারতো ; মলয়ের প্রেম অদৃশ্য ডানার মতো ঢেকে রাখতো, জড়িয়ে রাখতো ওকে—পৃথিবীর কোনো মলিনতা ওকে স্পর্শ করতে পারতো না। বলেছি, মলয় এ-সব বিষয়ে কথা বলতো কম, কিন্তু একদিন—এক রাত্তিরে—বলেছিলো, কোনো নাম করেনি, শুধু বলেছিলো. "তাকে প্রথম যখন দেখেছিলাম, তার ঘন চুলের কালো অরণ্য ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি।"

'এমনি ক'রে যে-মলয়কে আমি রচনা করেছি, শর্বরী তার প্রেমে প'ড়ে গেছে ; সেই মলয়কে এখন আমি কী ক'রে পথ থেকে সরাই ? এখন যে-কোনো বিষয়েই কথা উঠুক না, ঘুরে-ফিরে আসতেই হবে মলয়ের কাছে। যে-কোনো উপলক্ষ্যে—মলয় কী করতো, আর কী ভাবতো, মলয় কবে কী বলেছিলো, কোন চিঠিতে কী লিখেছিলো—তারই আলোচনা। স্মৃতিশক্তির উপর অত্যাচার ক'রে শর্বরী অনেক খুঁটিনাটি উদ্ধার করেছে, কিন্তু হাজার হোক, এক বছরেরই তো আলাপ। একই গল্প ন' শো এগারো বার শুনলাম, এবং ন'শো বারো বার সায় দিলাম। এখন এমন হয়েছে যে আগে থেকেই বুঝতে পারি, মলয়ের জীবন-কাহিনী থেকে কোন প্যারাগ্রাফ আসছে। আপত্তি করতে পারি না: তবু তো ওকে দেখছি, ওর কথা শুনছি—এই আমার

লাভ। এদিকে বিয়ের কথা তোলাও অসম্ভব—কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে অসম্ভব। যে-মলয়কে আমিই তৈরি করলাম, তার এমন অপমান করি কী ক'রে? তাহ'লে শর্বরী হয়তো আমার আর মুখও দেখবে না। ও যে আমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালো—হ্যাঁ, ভালোইবাসে বলতে হবে, তা শুধু আমি মলয়কে শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি ব'লে। অথচ শর্বরীকে—কৃষ্ণকেশী শর্বরীকে আমি ভালোবেসেছি, সত্যি ভালোবেসেছি;—মণিকার সঙ্গে ব্যাপারটা যে আসলে ভালোবাসাই নয়, তা এখন বুঝতে পারছি।

'মণিকা বলতে মনে পড়লো। সেটা আবার শর্বরী কী ক'রে যেন জেনেছে। একদিন—অনেকদিন আগে—ওর সঙ্গে আলাপের প্রথম অবস্থায়, শর্বরী আমাকে হঠাৎ জিগেস করলে, "মণিকাকে তুমি চিনতে না?"

'প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে গেলাম। জানোই তো, সুকুমার, আমার উপস্থিতবুদ্ধি তোমার মতো ধারালো নয়। বোধহয় একটু লাল হ'য়েও উঠেছিলাম। আমতা-আমতা ক'রে যে-জবাব দিয়েছিলাম, সেটার বিশেষ-কোনো মানে হয় না।

'এর পরে মাঝে-মাঝে ও মণিকার কথা শুনতে চাইতো, আমি চুপ ক'রে থাকতাম। আমার একটু ভয়ই

হয়েছিলো, কিন্তু শিগগিরই ও মণিকাকে ভুলে' গেলো। বোধ হয় ও বুঝতে পেরেছে যে ওটা আসলে কিছু নয়, নইলে মণিকার প্রসঙ্গ আমার কাছে অপ্রীতিকর হবে কেন? এখন মুশকিল হয়েছে মলয়কে নিয়ে। আচ্ছা বিভূতি, বলো তো তুমি এ-অবস্থায় পড়লে কী করতে?'

জবাব দিলে সুকুমার, 'আমি হ'লে শর্বরীকে চিঠি লিখতাম, "কাল রাত্তিরে ঈশ্বর এসে আমাকে ব'লে গেলেন যে তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো, তাহ'লে তোমার জন্য তিনি অনন্ত নরকবাসের ব্যবস্থা করবেন। অনন্ত নরকবাসের চাইতে কি আমি ভালো নই?' "

সুকুমারের কথাটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে বজ্রধর আমার মুখের দিকে তাকালো।

আমি বললাম, 'উপস্থিত মুহূর্তে আমি কিছুই বলতে পারবো না, বজ্রধর। আমাকে ভাবতে সময় দাও।'

সুকুমার বললে, 'আমি এক ভদ্রলোককে জানতাম, যিনি বলতেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন সমস্যার মীমাংসা করতে তাঁর লাগে পনেরো মিনিট, আর ছোটোখাটো ঘরোয়া সমস্যাগুলো দেড় থেকে দু' মিনিটের মধ্যে হ'য়ে যায়। সেই ভদ্রলোককে এখন পেলে হ'তো।'

বজ্রধরের মুখ দিয়ে যে-শব্দটা বেরুলো, সেটা অত্যন্ত শ্রুতিকটু।

৩

সুকুমার মৃদুকণ্ঠে ড্রাইভরকে বললে, 'এণ্টালি।'

এই ভর-দুপুরে এণ্টালিতে সুকুমার সেনের কী প্রয়োজন বা আকর্ষণ থাকতে পারে, এ-প্রশ্ন করায় ও শুধু একবার ওর ফোলা-ফোলা চুলের উপর আঙুল বুলোলো। প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা গেলো। সংক্ষিপ্ত জবাব এলো, 'অমিতার কাছে।'

'সেটা তুমি না-বলতেই বুঝেছিলাম, কিন্তু—'

'ব্যস্ত হচ্ছো কেন? একটু পরে তো প্রত্যক্ষই করবে।'

করলাম প্রত্যক্ষ। অমিতা চন্দ তার ঠাণ্ডা, আধো-অন্ধকার ঘরে ব'সে পীসবোর্ডের উপর নানা রঙের কাগজের টুকরো আঠা দিয়ে লাগিয়ে-লাগিয়ে একটা বিচিত্র মনুষ্যমূর্তি বানাবার দুরূহ এবং প্রশংসনীয় চেষ্টা করছিলো। স্নানান্তে তার গায়ে একটা হলদের উপর কালো ছোপ-বসানো ড্রেসিং গাউন, খোলা গলায় শাড়ির লাল-পাড় আঁচলটা চাদরের মতো ক'রে জড়ানো; চুলগুলো দু'ভাগ হ'য়ে কাঁধের উপর দিয়ে বুকের উপর এসে লোটাচ্ছে।

সুকুমার ঢুকেই বললো, 'তোমাকে চিতা-বাঘের মতো দেখাচ্ছে।'

'খিদেও পেয়েছে চিতা-বাঘের মতোই। খেয়ে আসবো ?'

'অনেকদিন পর কোনো মেয়েকে দেখে এইমাত্র মুগ্ধ হওয়া গেছে—তাই তোমার এ-অভদ্রতা ক্ষমা করলাম। খেতে আমাদেরও হবে, এবং সে-অনুষ্ঠানটা যাতে যথাশীঘ্র সম্পাদিত হ'তে পারে, সে-জন্য তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করছি। পাঁচ মিনিট।'

'তুমি জানো, সুকুমার, আমি এই অসময়ে কিছুতেই তোমাদের খেতে বলবো না। বোহিমিয়ানিজম-এর দিন গেছে। পৃথিবীর সব চমৎকার ফ্যাশনের যা হয়, ওরও তা-ই হয়েছে ;—কয়েকজন লোক দায়ে প'ড়ে সেটা শুরু করে, পরে সবাই তাদের অনুকরণ ক'রে জিনিশটাকে প্রেমে পড়ার মতোই মামুলি ক'রে তোলে। আচ্ছা, আজকালকার সাহিত্যিকরা নাকি প্রেমে-পড়ার চল তুলে দিচ্ছেন ? ও নাকি ঘোরতর সেকেলে ব্যাপার। সেকেলে হ'তে আমার মন কিছুতেই সরবে না, অথচ ও-আপদ তো আমার একটা-না-একটা লেগেই আছে।'

'তোমার কিছু ভয় নেই, নারী। সাহিত্যিকদের কাঁচকলা দেখিয়ে আরো দু'জন লোক হৃদয়ের চর্চায় নিযুক্ত। সুতরাং সেকেলে যদি হ'তেই হয়, তুমি—মানে, তোমরা—নিতান্ত নিঃসঙ্গ হবে না।'

'আমাদের জানাশোনার মধ্যে আর কে—? দাঁড়াও, ভেবে দেখছি।—ও—'

'বজ্রধর তো বিয়ে করবার জন্য খেপে গেছে।'

'বেশ তো—করুক না।'

'এ-কথা ভেবে ভুল করছো, অমিতা, যে তোমার অনুমতির জন্যই ও অপেক্ষা করছে। কেননা, বজ্রধর যাকে বিয়ে করবে ব'লে ভাবছে, সে তুমি নও।'

'না-হ'লেও তার হ'য়ে আমি অনুমতি দিতে পারি। তোমরা পুরুষরা এ-কথা কেন সর্বদা ধ'রে নাও যে মেয়েদের মনে তোমাদের মতো কোনো আবেগ হ'তে পারে না?'

'হয়েছে নাকি আবেগ? সত্যি? জানলে কী ক'রে?'

'কী ক'রে আবার! যেমন ক'রে সবাই জানে। আজ থেকে জানি? ওদের তখন পরিচয় হয়েছে মাত্র। শর্বরী একদিন এসে এটা-ওটা আলাপ করতে লাগলো। বয়স্ক লোকের এই লাজুক-ভাবটা আমার বরদাস্ত হয় না। মনে-মনে আমি সেই কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ, শর্বরীর "টেনিসন-এর আগে পোয়েট-লরিয়েট কে ছিলো?" প্রশ্নের উত্তরে আমি ব'লে ফেললাম, "হ্যাঁ, এর আগে মণিকা ছিলো, তা সে চুকে-বুকে ভূত হয়েছে। এর পরে তোমার পালা।" শর্বরী মোটেও না-বোঝবার বা অখুশি

হবার ভাণ করলে না। তারপর সাহিত্যের বদলে আমরা যে-জিনিশের চর্চা করলাম, আজকালকার সাহিত্যে তা অর্চনীয়।'

'পালা-বদল করবার খুব গরজ দেখালো নাকি শর্বরী?'

'পালা-বদল মানেই তো মালা-বদল? কিন্তু বজ্রধর তোমাকে পাঠিয়েছে কেন? নিজে এলেই পারতো।'

'বজ্রধর আমাকে পাঠায়নি। না—সত্যি।'

'আমি তোমাকে শুধু একটি খবর দেবো—সে-খবর মূল্যবান। শর্বরী সেদিন মোটরে ওঠবার মুখে মুখ ফিরিয়ে আমাকে জিগেস করলে, "মণিকা কে, জানো?"—নাও এবার, তোমাদের মতো আমি সকাল সাতটা থেকে এগারোটার মধ্যে চার বার চা খাইনে। আর রূপকথার রাজকন্যা আমি নই যে আমার খিদে পাবে না। তুমি যদি কখনো কোনো বই লেখো, সুকুমার, আশা করি তার নায়িকার আহার-বর্ণনা সবিস্তারে করতে ভুলবে না।'

'নিশ্চয়ই ভুলবো, কারণ জীবমাত্রকেই যে আহার করতে হয়, এ-কথা সবাই জানে।' ✱

৪

বাইরে এসে সুকুমার বললে, 'গর্বিত হও, বিভূতি—সুকুমার সেন এ-বেলা তোমার সঙ্গে খাবে।'

বেলা তখন দুপুর ছাড়িয়ে গেছে। ছোটো-ছোটো বাতাসে সার্কুলর রোডে ধুলোর ঘুর্ণি উড়ছে। সকাল-বেলাটা বসন্ত হ'লেও মধ্যাহ্ন গ্রীষ্মের। দিনের সঙ্গে-সঙ্গে আমার মেজাজও গরম হচ্ছিলো, তাই আমি চুপ ক'রে রইলাম। বিশ্রী কথা বলার চাইতে চুপ ক'রে থাকা ভালো।

এলো বিকেল—লম্বা ছায়া ফেলে, ঠাণ্ডা হাওয়া ছড়িয়ে। চায়ের পর সুকুমার বললে, 'চলো শর্বরীর কাছে।'

আমি (আশা করি) দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, 'একদিনের পক্ষে যথেষ্ট ঘোরা হয়েছে। এখন আর কেউ আমাকে ঘরের বা'র করতে পারবে না।'

কিন্তু সুকুমার পারলো। সুকুমার কী না পারে? যদিও তখন পর্যন্ত আমি শর্বরীকে চিনি না, যদিও সন্ধ্যায় আমি অতিথি আশা করছিলাম—তবু।

বজ্রধর-বর্ণিত লাল একতলা বাড়ির ফটকে সুকুমার নামলো। আমি গাড়িতে ব'সে অপেক্ষা করলাম। ব'সে

ভাবতে লাগলাম, হাতের উপর চিবুক, উরুর উপর কনুই, পায়ের উপর পা রেখে একটি মেয়ে ব'সে আছে—তার ঘন চুলের কালো অরণ্য দেখে অমাবস্যার তারার কথা মনে পড়ে—ব'সে-ব'সে ভাবছে, কখন আসবে বজ্রধর, এসে সেই ওর একটি মরা বছরকে আবার বাঁচিয়ে তুলবে।

মনটা আর-একটু হ'লেই করুণ কোমল হ'য়ে উঠতো, ভাগ্যিশ সেই মুহূর্তে অতিশয় মন্থর পদক্ষেপে সুকুমারকে বাগান অতিক্রম করতে দেখা গেলো।

—'কী হে, এত শিগগির এলে?'

সুকুমার ধপ ক'রে আমার পাশে ব'সে প'ড়ে এমন আরামের নিশ্বাস ছাড়লো, যা শুনলে মন ভালো হয়।

—'পদ্মপুকুর।'

'এখন আবার বজ্রধরের কাছে? তোমার আজ হয়েছে কী?'

'ওর বিয়ের খবরটা ওকে দিয়ে আসা যাক।'

'শুনি?'

'শোনো। শর্বরী অবশ্যি বুঝতে পারেনি, আমি ঐ জন্যেই এসেছি। প্রসঙ্গক্রমে কী ক'রে আসল কথা উত্থাপন করতে হয়, তা আমি জানি। শর্বরী—বেচারার অবস্থা কাহিল—বজ্রধরের নাম করা মাত্র সেটা লুফে নিলে। অন্য-কোনো বিষয়ে—আমি চেষ্টা করেছিলাম—

কথা উঠতেই দিলে না। পরে বললে, "কোনো আশা দেখছিনে, সুকুমার। ও এত ভালো, এমন unsophisticated! আজকালকার ছেলেদের মতো—তোমার মতো—cynicsm-এর বিশ্রী ভাণ নেই, একেবারে নিরহংকার, নিরলংকার, নির্মল। ওর অমন উৎকট, কটমট নাম কে রেখেছিলো? ওর নাম অমল হ'লে মানাতো, মনে-মনে আমি ওকে অমল ব'লে ভাবি "

'"অমলবাবুকে হিংসে হচ্ছে, শর্বরী।"

'"ঈশ্বর আমাদেরও একটি নির্মল হৃদয় দিয়েছিলেন, সুকুমার, আমরা নানা আঁকিবুঁকি কেটে সেটাকে নষ্ট ক'রে ফেলেছি। বজ্রধর তা করে নি। ওর পবিত্রতা আমাকে—হ্যাঁ, পীড়াই দেয়। জানো, মণিকাকে ও ভুলতে পারেনি। আমি ভেবেছিলাম—অমিতা আমাকে তা-ই বুঝতে দিয়েছিলো,—কিন্তু ভাগ্যিশ কিছু বলিনি—ছী-ছি, তাহ'লে কী লজ্জাই পেতাম। মণিকার নাম করতেই ওর মুখে রক্ত উঠে আসে; একেবারে বোবা ব'নে যায়। সেইজন্যেই মলয়—মলয় সে-সময়ে ওর বন্ধু ছিলো—মলয়ের উপরও ওর শ্রদ্ধার সীমা নেই। ও ভাবছে, ও যেমন মণিকাকে, আমিও তেমনি মলয়কে—কিন্তু আমি যে নানারকম আঁকিবুঁকি কেটে আমার হৃদয়কে নষ্ট ক'রে ফেলেছি, তা তো আর ও জানে না। ও জানে না, ও

যখন আমার সঙ্গে মলয়ের বিষয়ে আলাপ করে, আমি কত ক্লান্ত হই, কত চেষ্টায় হাই চাপি। অবশ্যি ওকে খুশি করবার জন্য আমিও উৎসাহ দেখাই ; এমনকি, এক ভাঙা বাক্স থেকে মলয়ের চিঠিগুলো—বানান ও ভাষার ভুলে ভরা চিঠিগুলোও টেনে বা'র করেছি। আমি জানি, ও আমার কাছে কী আশা করে ; ওর সেই আশা পূরণ করবার জন্য আমি যখন-তখন মলয়ের কথা তুলি—মলয়-সম্বন্ধে করুণ হবার ভাণ করি ;—এত কষ্ট করি শুধু ওর শ্রদ্ধা অর্জন করবার জন্য—কিন্তু মন কি শুধু শ্রদ্ধাই চায়। প্রথমে খেলাচ্ছলে শুরু করেছিলাম, কিন্তু এখন এ-ই হ'য়ে উঠেছে সব। এখন আর ওর মোহ ভাঙা সম্ভব নয়। সে বড়ো বেশি নিষ্ঠুর হবে, সুকুমার। আমার কেমন ক্লান্ত লাগছে—বজ্রধর আমাকে খুবই ভালোবাসতে পারতো, কিন্তু ওর হৃদয় এত পবিত্র না-হ'লেও তো পারতো। মণিকা—" এই যে, এলাম।'

'ব্যাপার ভারি মজার হে। বজ্রধরটা কী বোকা!'

'বোকা নয় হে, ভালো, বড়ো বেশি ভালো। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে যদি ও শর্বরীকে বিয়ে ক'রে না ফেলে, তাহ'লে ওকে বোকা ব'লেই সন্দেহ করবো।'

৫

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন যে ওদের বিয়ে হ'লো না, সে-কথা—অসংখ্য আঁকিবুঁকি কেটে হৃদয়কে যারা নষ্ট ক'রে ফেলেছে, কী ক'রে তাদের বোঝানো যায়? এক মাস গেলো; সুকুমারের ভবিষ্যদ্বাণী আংশিকরূপে সফল হ'লো—অর্থাৎ, শর্বরী স্বগৃহ পরিত্যাগ করলো, কিন্তু পদ্মপুকুরের সিঁড়িতে পদ্ম ফুটলো না—গ্রীক গির্জার পিছনের ছোটো লাল বাড়িটির শাদা ফটক বন্ধ হ'লো, বন্ধ হ'লো সবুজ শেডের নিচে সবুজ জানলার পাট—আমাদের সকলকে তাক লাগিয়ে শর্বরী এমন-একটা কাজ করলে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি হ'লে যা মানাতো। শর্বরী ভাইকে নিয়ে মুসৌরি চ'লে গেলো—আসন্ন গ্রীষ্মটা ওখানেই কাটাবে ব'লে।

ব্যাপারটা একটু জটিলই। বোঝানো শক্ত। বজ্রধরের মুখে শুনে সুকুমার কিছুতেই 'point'টা বুঝতে পারেনি। এর আদৌ কোনো 'point' আছে কিনা, সে নিয়ে তর্ক করা যায়। বজ্রধর বলে—বলবেই তো!—এ না-হ'য়েই নাকি উপায় ছিলো না, অন্যায় না-জেনে করলেও অন্যায়।

অবাক হচ্ছেন? এখানে আবার অন্যায়ের কথা এলো কিসে? বজ্রধর ঐ রকমই—ও কেন মলয়ের

নামের অপব্যবহার করেছিলো, এটুকু বক্রতার কোন প্রয়োজন ছিলো ওর, এত তাড়াই বা কেন করলে? অপেক্ষা করলে, সবই হ'তো। এই—ওর মতে—নিদারুণ অপরাধে ওদের সমস্ত জীবন ভণ্ডুল হ'য়ে গেলো—আমাদের মতে যা অনিবার্য তা হ'লো না, ওর মতে যা অবশ্যম্ভাবী, তা-ই হ'লো। সুকুমারের মধ্যস্থতায় সব ঘোর-প্যাঁচ পরিষ্কার হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও বজ্রধরের মন নাকি আশানুরূপ পরিষ্কার হয়নি ; একটা কেমন-কেমন ভাব নিয়ে পরের দিন ও শর্বরীর কাছে গিয়ে—

বাকিটা নিয়ে একটা ছোটোখাটো নাটক হয়। যেমন :

[সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে। বাগানে দুটো ডেক-চেয়ার অত্যন্ত নিচু ক'রে পাশাপাশি পাতা। একটাতে শর্বরী ব'সে। আর-একটার শূন্যতা এইমাত্র পূর্ণ করলো বজ্রধর।]

শর্বরী। তুমি এত দেরি ক'রে এলে!

বজ্রধর। ভাবছিলাম, আসবো কিনা। হঠাৎ এমন-একটা ব্যাপার—

শর্বরী। ঠিক এমনি সংকোচ মলয়েরও ছিলো।

বজ্রধর। তুমি চুপ করো, শর্বরী।

শর্বরী। চুপ করবো? কেন?

বজ্রধর। কেন নয়, এমনি। দু'জন অন্তরঙ্গ নীরবে ব'সে আছে, এ-দৃশ্য দেখতে দেবতারা ভালোবাসেন। কথা না-কইলেই কি নয়—অন্তত, আজকের মতো? তুমি কি কখনো ভাবো, শর্বরী?

শর্বরী। এখন আমরা দু'জনে পাশাপাশি ব'সে ভাববো তো? বেশ। কিন্তু কার—কিসের কথা ভাববো?

বজ্রধর। তোমার মতে, তুমি মলয়ের কথা ও আমি মণিকার। কিন্তু আমার মতটা অন্য রকম।

শর্বরী (সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে)। মানে?

বজ্রধর। একটা ইংরিজি কবিতা মনে পড়ছে—শুনবে? মানে, কবিতাটা নয়, গল্পটা।

শর্বরী। কার?

বজ্রধর। লেখকের নামটা স্মরণীয় নয়। পঞ্চম শ্রেণীর কবি।—কিন্তু শুনবে?

শর্বরী (আবার গা এলিয়ে)। বলো।

বজ্রধর। একটি ছেলে প্রেমে ব্যর্থ হ'য়ে এক পুকুরে গেলো ডুবে মরতে। গিয়ে দেখে, একটু দূরে একটি মেয়ে ব'সে আছে। ডেকে জিগেস করলে, 'তোমার swain বুঝি আমার nymph-এর মতোই নিষ্ঠুর? তাই বুঝি ডুবে মরতে এসেছো?'

মেয়েটি জবাব দিলে, 'আহা—তোমারও বুঝি সেই দশা? মেয়ের প্রাণ এত কঠিন হয়? এসো, দু'জনে একসঙ্গেই মরা যাক।'

ছেলেটি প্রতিধ্বনি ক'রে বললে, 'মরা যাক।'

শর্বরী। ভূতের গল্প?

বজ্রধর। শোনোই না।—দু'জনেই মরতে প্রস্তুত, কিন্তু কেউই জলে নামছে না। ছেলেটি পায়ের আঙুল দিয়ে জলটা একটু ছুঁয়েই শিউরে উঠলো—'উঃ, কী ঠাণ্ডা!'

মেয়েটি পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠলো: 'ইশ, জলগুলো কী কালো আর নোংরা আর বিশ্রী!'

ছেলেটি বললে, 'শীতকালটা যাক, তারপর গ্রীষ্ম এলে দু'জনে একসঙ্গে মরা যাবে।'

মেয়েটি প্রতিধ্বনি ক'রে বললে, 'মরা যা'বে।'

শর্বরী (আবার উঠে ব'সে)। এ-গল্প তুমি নিজে বানিয়ে বলছো?

বজ্রধর। না, কবিতা একটা সত্যি আছে, তবে হয়তো কিছু বাড়িয়ে-টাড়িয়ে বলতে পারি।—তারপর, শোনো। তারপর ওরা সেই পুকুরের ধারে এক কুটির বাঁধলে শীত কাটাবে ব'লে—গ্রীষ্ম এলেই মরবে। শীত এলো। বরফে পৃথিবী শাদা হ'য়ে গেলো, পুকুরের জল

গেলো জ'মে। তারপর গ্রীষ্মের সূচনা দেখা দিলো। পৃথিবীতে সবুজের আভা এলো, পুকুর গ'লে জল হ'লো —ঈষদুষ্ণ জল। অনেকদিন পর ওরা দু'জন ঘরের বাইরে এলো।

ছেলেটি জিগেস করলে, 'মরবে?'

মেয়েটি প্রতিধ্বনি ক'রে বললে, 'মরবে?'

ছেলেটি বললে, 'ও বড়ো ঝকমারি। তার চেয়ে এসো আমরা বিয়ে করি।।'

মেয়েটি প্রতিধ্বনি ক'রে বললে, 'এসো করি।'

শর্বরী (ঝুঁকে বজ্রধরের মুখের দিকে চেয়ে)। আমাকে এ-গল্প বলার মানে?

বজ্রধর। গল্পটার একটা moral আছে, শর্বরী।

শর্বরী (খপ ক'রে বজ্রধরের হাত ধ'রে)। এ-moral-এ তুমি বিশ্বাস করো?

বজ্রধর। তুমি কি মলয়কে ভুলে' যাওনি?

শর্বরী (বজ্রধরের হাত শক্ত ক'রে আঁকড়ে)। তুমি কি মণিকাকে ভুলে' গিয়েছো?

বজ্রধর। হ্যাঁ।

শর্বরী। হ্যাঁ। (ব'লেই বজ্রধরের হাত ছেড়ে দিয়ে শুয়ে প'ড়ে হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো। খানিকক্ষণ নীরবতা।)

বজ্রধর। শর্বরী।

শর্বরী। (নীরব)

বজ্রধর। শর্বরী।

শর্বরী। (নীরব)

বজ্রধর। শর্বরী।

শর্বরী (চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে)। আমরা এতদিন খেলা করছিলাম, বজ্রধর!

বজ্রধর। হ্যাঁ, এতদিন খেলাই হচ্ছিলো ; কিন্তু আজ তোমাকে একটা সত্যি কথা বলবো?

শর্বরী। (নিম্নস্বরে) আজই বলবে? এখনি?

বজ্রধর। হ্যাঁ, সেইজন্যই তো আজ আসতে দেরি হ'লো।

শর্বরী। ও।

বজ্রধর। শর্বরী।

শর্বরী। বলো।

বজ্রধর। বলবো? শর্বরী, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

শর্বরী। তারপর?

বজ্রধর। শর্বরী, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

শর্বরী। হ'লো? এইবার আমার পালা।

বজ্রধর। বলো।

শর্বরী। বলবো? বজ্রধর, আমি তোমাকে ভালো-বাসি।

বজ্রধর। তারপর?

শর্বরী। বজ্রধর, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

(হঠাৎ দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠলো। তারপর বেশ খানিকক্ষণ নীরবতা।)

বজ্রধর। যাই এবার।

শর্বরী। তুমি কখনো ছোটো ছিলে, বজ্রধর? সন্ধেবেলায় আকাশের তারা গুনে ঘরে যেতে না? ত্যাখো, ঐ একটিমাত্র তারা ফুটেছে আকাশে। এখন ঘরে যেতে নেই। সাত তারা যখন ফুটবে, তখন তুমি যাবে।

বজ্রধর। এক তারা দেখে ঘরে গেলে কী হয়?

শর্বরী। কে জানে কী হয়। মলয় বলতো—

বজ্রধর। থেমে গেলে যে?

শর্বরী। এমনি। (হেসে) মলয়ের কথা বলা অভ্যেস হ'য়ে গেছে, দেখছি।

বজ্রধর। কী অদ্ভুত, ভাবো তো শর্বরী এখন যদি মলয় এখানে এসে উপস্থিত হয়—

শর্বরী। থাক, ও-কথা আর কেন?

বজ্রধর। না, কিসে যে কী হয়, কেউ বলতে পারে না।

আচ্ছা, এখন যদি শুনি, মলয়-মণিকার বিয়ে হচ্ছে, সে কেমন হয় ?

শর্বরী। কেমন আবার হবে ? কথা বোলো না, বজ্রধর। ঐ ছাখো—দুই—না, তিন তারা ফুটেছে।

বজ্রধর। আচ্ছা, মলয়-মণিকা যখন এ-খবর শুনবে, কী ভাববে ওরা ?

শর্বরী (ক্ষীণস্বরে)। কী আবার ভাববে।

বজ্রধর। কিছুই ভাববে না ? আচ্ছা শর্বরী, তুমি মলয়কে ভালোবাসতে ?

শর্বরী। বজ্রধর, তুমি মণিকাকে ভালোবাসতে ?

বজ্রধর। তখন তো তা-ই মনে হ'তো।

শর্বরী। তখন তো তা-ই মনে হ'তো।

বজ্রধর। আশ্চর্য, না ?

শর্বরী। আর কথা বোলো না, বজ্রধর। চার তারা—

বজ্রধর। আচ্ছা শর্বরী, চার বছর পর আমরাও তো পরস্পরকে একেবারে ভুলে' যেতে পারি !

শর্বরী। তা ভুলবো না, কারণ আমরা সর্বদা কাছাকাছি থাকবো।

বজ্রধর। আর না-থাকলেই ভুলতাম ? তোমার কথার কি তা-ই মানে নয় ?

শর্বরী। তুমি এইমাত্র যে-গল্পটা বললে—

বজ্রধর (উঠে দাঁড়িয়ে)। হ্যাঁ, আমিই বলেছি। Moralটা বড়ো বেশি সত্যি—না, শর্বরী ? কেন আমি ওটা বলতে গেলাম ?

শর্বরী। একটু বোসো বজ্রধর, একটু। পাঁচ—পাঁচ, ঐ যে ছ' তারা ! (হাতে ধ'রে) একটু বোসো না।

বজ্রধর (শর্বরীর হাতে চাপ দিয়ে)। তখন ওটাই কি কম সত্য মনে হয়েছিলো ? কী বলো, শর্বরী ? ঠিক এখনকার মতই কি নয় ? চার বছর পর আমাকে ভুলে'ই যেয়ো, শর্বরী, আমি তোমাকে ভুলি কিনা দেখা যাবে। (হাত ছেড়ে দিয়ে) সে-ই ভালো। প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিলে তবে মনে থাকে। আশ্চর্য— না, শর্বরী ?

শর্বরী (রুদ্ধস্বরে)। মানে ?

বজ্রধর। আকাশে সাত তারা ফুটলো।

(বজ্রধর দৃঢ় পদক্ষেপে বাগান পেরিয়ে রাস্তায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।)

শর্বরী (কয়েক মিনিট পরে)। দাদা।

(বাড়ীর ভিতর থেকে লম্বা একটি ছেলে বেরিয়ে শর্বরীর কাছে এসে দাঁড়ালো। তার মুখের সিগারেট জ্বালানো নয়, হাতে দেশলাই।

শর্বরী। কাল সকালে উঠেই একটা কাজ করবে,

দাদা? মুসৌরির দুটো টিকিট কিনে আনবে। জহরকে বলে' দিয়ো, জিনিশপত্তর বেঁধে-ছেঁদে রাখে যেন।

দাদা। মুসৌরি—

শর্বরী। হ্যাঁ, মুসৌরি। তুমি যা-ই বলো, অন্য-কোথাও আমি যাবো না। বাড়িটা ক'মাস বন্ধই থাক। ভাড়া দিলে নষ্ট হবে।

দাদা। কিন্তু—

শর্বরী। না, দাদা—তুমি আপত্তি কোরো না—কলকাতায় আর ভালো লাগছে না আমার।

দাদা (সিগারেটের জন্য দেশলাই জ্বালালো, কিন্তু সিগারেট ধরাবার আগেই কাঠিটা তার হাত থেকে প'ড়ে গেলো)। তোমার চোখে ও কী, শর্বরী?

শর্বরী। জল, দাদা। বাজে জিনিশ বলতে পারো। জলের কি কোনো দাম আছে? ঘরে চলো, দাদা—আকাশে যে অনেক সাত তারা ফুটলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

অতনু মিত্র আর সাবিত্রী বোস—আর [illegible]নু

সুন্দর চেহারা আমাদের অতনু মিত্রর। ওর সৌন্দর্য কানের কাছে চুপি-চুপি কথা কয় না, তারস্বরে চীৎকার করে—অন্যমনস্ক হ'য়ে থাকবার জো নেই; অনেক লোকের মধ্যে লক্ষ্য না-ক'রে উপায় নেই। বেচারার নিজের আর দোষ কী? বিধাতাই ওকে এমন ক'রে তৈরি করেছেন যে ওর কপালের ওপর বড়ো-বড়ো অক্ষরে 'আমার দিকে তাকাও' লেখা থাকলেও কোনো ক্ষতি ছিলো না। তাকাতে ওর দিকে হয়ই।

মাজা গায়ের রং; ফর্শা বললে তার বর্ণনা হয় মাত্র, ব্যঞ্জনা হয়না। গ্রীক দেবতার মতো নাক; বড়ো, গভীর-কালো চোখ—আলস্যে, বাসনায় টলটলে দুই চোখ, লম্বা, সরু পলকগুলি বেড়ার মতো তাদের ঘিরে আছে। টশটশে ঠোঁট দু'টি ঈষৎ ফাঁক হ'য়ে থেকে ঝকঝকে দাঁতের একটু আভাস দেয়; শানের মতো পালিশ-করা কপাল তাকে ললাট-ফলক বললে কবিত্ব হয় না; সিল্কের মতো পাৎলা, নরম চুল—

কিন্তু এ-ই থাক। আপত্তি উঠতে পারে—পুরুষ-মানুষের চেহারা, তা যত ভালোই হোক ও নিয়ে অত

ফ্যানানোর কী দরকার। ঠিকই, আমার হয়তো একটু বাড়াবাড়িই হয়েছে ; কিন্তু অতনুর এই সুন্দর চেহারা তাকে একবার যে বিপদে ফেলেছিলো, তা-ই নিয়েই এই গল্প ; বলা যেতে পারে, এই গল্পের নায়ক অতনু নয়, অতনুর চেহারা। কেননা, অনুচর চেহারার জন্যই তো মেয়েরা সব পাগল হ'য়ে গেলো, এবং সব মেয়েরা পাগল হ'য়ে গেলো দেখেই তো সাবিত্রী বোস পণ করলে, অতনুকে জয় করতেই হ'বে ; এবং সাবিত্রীর হাতে একবার ধরা দিয়ে ফেলে তারপর হঠাৎ অন্যত্র হৃদয়াবেগের সঞ্চার হ'লো ব'লেই তো অতনু পড়লো মুশকিলে, এবং অতনু দায়ে পড়ে' আমাকে অনেক কথা ব'লে ফেলেছিলো ; তাই না আমি এ-গল্প লিখতে পারছি।

গোড়ায় দেখা যাচ্ছে ওর চেহারা ; মামুলি রীতি-অনুসারে, তাই, গোড়াতেই শুরু করলাম।

সুকুমার ঠাট্টা করবার চেষ্টা ক'রে বলতো, 'যেমন নাম, তেমনি চেহারা ! আহা আমার কিউপিড রে !'

সুনীল ঠাট্টা করতো, 'যেমন চেহারা, তেমন চরিত্র ! "কী করা হয়, মশাই ?" "প্রেম।"

সুনীল আমাদের আর্টিস্ট বন্ধু—চৌকো-মুখো পুরুষ এঁকে নাম করেছে। ওর চোখের ভিতর মিকায়ে-লেঞ্জোলোর মতো লালচে ছিটে আছে ব'লে ওর ভারি

দেমাক। ও ঠিক ক'রে রেখেছে, বছর দশেকের মধ্যে ও প্রকাণ্ড একটা-কিছু না-হ'য়ে যাবে না। অতনুর চোখ যতই সুন্দর হোক্, তাতে লালচে ছিটে-ফিটে কিছু নেই—সুনীল তাই ওকে কথায়-কথায় ঠোকে। সুনীল একটা জিনিশ কিছুতেই বুঝতে পারে না—অতনুর সঙ্গে কেন মেয়েরা এত প্রেমে পড়ে—খেয়ে-দেয়ে ওদের আর কি কাজ নেই কোনো? প্রেমেপড়া ব্যাপারটাই বাজে; কিন্তু যদি এমন-কোনো মেয়ে থাকে, যার নেহাৎই প্রেমে না-পড়লে নয়—আসুক না সে সুনীলের কাছে! হ্যাঁ, অতনুর চেহারা ভালো হ'তে পারে, কিন্তু জিনিয়স···! ইজাডোরা ডানকান বাংলা দেশে জন্মায়নি কেন? সুনীল ব্যানার্জি কলালক্ষ্মীর উপাসক; অতনু মিত্রর মতো যারা শুধু এক অঞ্চলের ঝাপটা খেয়ে আর এক অঞ্চলে ছিটকে পড়ে, তাদের ও বড়ো জোর করুণা করে।

অথচ, দোষ বলতে অতনুর কিছুই নয়। ওর সুন্দর চেহারাই ওর কাল হ'লো। কোনো মেয়েই ওকে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি—এক অমিতা চন্দ ছাড়া। অমিতা চন্দর মনটা নদীর স্রোতের মতো—মাঝখান দিয়ে ব'য়ে যায়, কোনোখানেই আটকে থাকে না। ওর হৃদয়টা তরল পদার্থ, তাই তার ভাঙবার আশঙ্কা নেই। অতনু না জেনে কত মেয়ের হৃদয় যে কাচের বাসনের মতো

গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে ভেঙে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের অমিতা—ফুরফুরে অমিতা—শুধু বেঁচে গেলো।

ওর প্রতি নারী-জাতির এ-দুর্বলতায় অন্তনু—আর যা-ই হোক—দুঃখে ম'রে যায় নি। অবশ্যি এ-দুর্বলতা না-থাকলেও ও শুকিয়ে ম'রে যেতো না। ওকে যারা শুধুই রমণীমোহন বলে' জানে, তা'রা ওর সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সুবিধে পেলে ও রামকৃষ্ণ মিশনে ঢুকে, দু'চার বার আমেরিকায় গিয়ে বত্রিশ বছরে মরতে পারতো। কিন্তু সুবিধেই যে ও পেলো না ছাই। বলতে গেলে, মেয়েদের আঁচলের হাওয়ায় ও বড়ো হয়েছে। ও যখন প্রথম ওর নিজের আকর্ষণী-শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হ'লো, তখন ওর বয়স—কত আর? চৌদ্দ কি পনেরো। সেই থেকে—বলা যায়—মেয়েরা ওকে মাথায় তুলে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই থেকে নারী-সংস্পর্শের নরম মাখন খেয়ে ওর অভ্যেস। হ'তে-হ'তে এমন হয়েছে অনেক অনুশীলনে ও ফ্লার্ট-করাটাকে একটা আর্টে পরিণত করেছে। অথচ মেয়েদের সঙ্গ ও উপভোগ করে না, সহ্য করে মাত্র। এ ছাড়া আর ওর উপায় কী? একা মানুষ; বাধিত করতে হয় অনেককে। এদেরই মধ্যে যে-কোনো একটিকে ও ভালোবাসতে পারতো, কিন্তু আর-সবাই ওকে ছেড়ে দেবে কেন? এবং সবাই যখন ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে,

তখন বিশেষ-একজনের দিকে বিশেষ-ভাবে মন দেবার সময় কোথায় ওর ? অতনুর কারবার হৃদয় নিয়ে নয়—তাতে অত টানা-হেঁচড়া সয় না। ওর ধারণা ছিলো, হৃদয় জিনিশটা সভ্য মানুষের শেষ কুসংস্কার। সত্যি-সত্যি তা-ই ধারণা ছিলো কিনা, জানিনা, তবে মুখে অন্তত ও তা-ই বলতো। মুখে ও অনেক অনাচারই ক'রে বেড়াতো—যদ্দিন না পনেরো বছরের একটি শ্যামলা মেয়ে—কিন্তু যখনকার যেটা।

আপাতত সাবিত্রী বোসের দিকে নজর দেয়া যাক।

২

একদা এক শনিবারে গ্লোব থিয়েটারে বেজায় ভিড় হয়। সাবিত্রী বোস আর অমিতা চন্দ এসে অনেক খোঁজা-খুঁজি ক'রেও পাশাপাশি দুটো চেয়ার পেলো না। ফিরে যাওয়ার চাইতে—ওরা ভাবলো—বরং আলাদা ব'সে দেখাই ভালো। ওরা যখন ঢুকলো, তখন পালা আরম্ভ হয়-হয়। যে যার জায়গায় বসা মাত্র অন্ধকারে সব গেলো হারিয়ে।

সাবিত্রী জানতো না যে ওর ঠিক পিছনেই অতনু মিত্র ব'সে আছে। অতনুকে ও তখনও চিনতো না। তাছাড়া,

ওর মন ছিলো ছবিতেই; আশে-পাশে তাকাবার ফুরসৎই নেই ওর।

অতনু কিন্তু ছবি দেখতে-দেখতে অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়; গল্পটা বুঝতে পারে না; ঘরসুদ্ধ লোক যখন হেসে ওঠে, ও চমকে উঠে পরদার দিকে তাকিয়ে হাসির কিছুই দেখতে পায় না। দেখতে পায় একটি শিঙ্গল-করা মাথার পিছন; দু'দিকের চুল ঘণ্টার মতো নেমে এসেছে; ঘাড়ের উপরটা পুরুষের মতো ছাঁটা। ও যদি আস্তে, খু—ব আস্তে ঐ ঘাড়ের উপর একবার হাত রাখে—রেখেই হাত তুলে আনে—তাহ'লে কি মেয়েটি টের পাবে? অথচ আর কোনো কথা অতনু ভাবতে পারছে না; অতনু দৃঢ়ভাবে হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে দিলে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে-মনে বললে, 'এইমাত্র কী সংঘাতিক সংযম অভ্যাস করলাম, তা যদি জানতে, ঈশ্বর!'

এমনি করে' ইনটর্ভেল এলো।

ঘরের আর-এক কোণ থেকে অনেক চেষ্টায় অমিতা এসে উপস্থিত হ'লো।—'আরে' অতনু!'

'অমিতা! তুমি! তোমার মতো cinema-hater—'

'সাবিত্রী জোর ক'রে নিয়ে এলো। ও, তোমাদের আলাপ নেই বুঝি? এই, সাবিত্রী!—'

সাবিত্রী আচমকা চোখ নামিয়ে নিলে।

অতনু বললে, 'আপনি এতক্ষণ আমার সাম্‌নে ব'সে ছিলেন ব'লে আমি কিচ্ছু দেখতে পারি নি। গল্পটা কী, বলুন তো!'

অমিতা বললে, 'আমার সঙ্গে জায়গা বদল করবে, অতনু? তুমিও ছবি দেখতে পাবে—আর আমিও সারাক্ষণ ছবি দেখবার শাস্তি থেকে রক্ষে পাবো।'

সাবিত্রী বললে, 'তা হবে না। তুমি এত বকর বকর করবে, অমিতা, যে আমি হয়তো কিছুই দেখতে পাবো না।'

অমিতা দূরে থাকা সত্ত্বেও ইন্‌টর্ভেলের পর সাবিত্রী কিছুই দেখতে পেলো না। না অতনু। মাঝখান থেকে বেচারা অমিতা সিনেমা দেখে মরলো।

এ পর্যন্ত গল্পের ভূমিকা।

৩

মাসখানেক পরে এক সন্ধ্যায় সাবিত্রীদের ড্রয়িংরুমে সায়েবি পোশাক-পরা এক আধবয়সি ভদ্রলোক পাইচারি করছিলেন। তাঁর মুখে পাইপ, দু'হাত ট্রাউজর্সের পকেটে ঢোকানো। মাঝে-মাঝে বাঁ হাত বা'র ক'রে

তিনি রিস্ট-ওয়াচ দেখছেন আর ভুরু কুঁচকোচ্ছেন। প্রায় পনেরো মিনিট পাইচারির পর শ্রান্ত হ'য়ে তিনি একটা সোফায় বসতে যাবেন, এমন সময় সাবিত্রীর প্রবেশ। ভদ্রলোক না ব'সে এগিয়ে গেলেন। সাবিত্রী বললো, 'বসুন।'

ভদ্রলোক মুখ থেকে পাইপ না নামিয়েই বল্‌লেন, 'সময় নেই। It's getting late for the theatre'.

সাবিত্রী বললে, 'বসুন।'

ভদ্রলোক মুখ থেকে পাইপ নাবিয়ে বললেন, 'I say, it's getting late for the theatre. And you not yet dressed! What the—'

সাবিত্রী বললে, 'Don't swear.'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমাকে আধ ঘণ্টার উপর বসিয়ে রাখা হয়েছে— অথচ not yet dressed! By—'

সাবিত্রী বললে, 'Don't swear.'

ভদ্রলোক চ'টে আগুন হ'য়ে বললেন, 'I'm not going to stand—'

সাবিত্রী মিষ্টি করে বললে, 'Please sit down.'

ভদ্রলোক বললে, 'Hell! I'm off.'

সাবিত্রী বললে, 'Thank you.'

একটু পরে সাবিত্রী টেলিফোন তুলে—'হ্যালো—that

you ?—এখন আসবে একবার ? থিয়েটরে যেতাম, সরকারকে ভাগিয়ে দিয়েছি।—আসবে ? That's all right. You'll find me quite ready.'

টেলিফোন রেখে সাবিত্রী উপরে চ'লে গেলো সাজসজ্জা করতে।

পরের দিন সরকার এসে বললেন, 'সাবিত্রী, কাল তুমি থিয়েটারে গিয়েছিলে—With a young man who looked like a professional lover—'

সবিত্রী বললে, 'Don't be ridiculous.'

সরকার গম্ভীরভাবে বললেন, 'I demand an explanation.'

সাবিত্রী বল্‌লে, 'It needs none.'

সরকার সাবিত্রীর হাত ধ'রে বললেন, 'Darling, I love you to desperation.'

সাবিত্রী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'I don't mind.'

এর পরে কোনো ভদ্রলোক সেখানে থাকতে পারেন না ; এবং সরকার যে ভদ্রলোক তা পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে। এ-বইয়ে এই ভদ্রলোকের আর-কোনো উল্লেখ পাওয়া যাবে না।

৪

অতনুর সঙ্গে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে সাবিত্রী টাল সামলাতে পারলো না, ছিটকে পড়লো। মাথায় তার রক্ত উঠে এলো। বিস্তীর্ণ কুয়াশার মতো সে চারদিক থেকে অতনুকে ঝাপটে ধরেছে—অতনুকে দেখলে আর চেনা যায় না।

সাবিত্রীর বাপ ব্যারিস্টর, বালিগঞ্জে ওদের বাড়ি। সাবিত্রীর অ্যাডমায়ারের দল বলে যে ও বাংলার আগে শেখে ইংরিজি বলতে। এবং ইংরিজির চেয়ে ভালো জানে ফ্রেঞ্চ। ওর ফ্রেঞ্চ বিদ্যার পরিধি নির্ণয় করবার যোগ্যতা আমার নেই ; তবে সুকুমারের মতামত এ-স্থলে লিপিবদ্ধ করলে অবান্তর হবে না। সাবিত্রীর কথাবার্তা—সুকুমার বলে—ইংরিজি-বাংলায় মিশোনো হ'লেও ফরাশী ভাষায় ওর দখল—সুকুমার বলে—ছু'টি কথায় সীমাবদ্ধ 'নেস্‌পা ?' ও 'মা' কি 'মর্ন' শের'। ঐ ছু'টি শব্দের ও এমন প্রচুর ব্যবহার করে যে তাকে অপব্যবহার বলা যায়। তবে, এটা ঠিক—সুকুমার বলে—যে ও-ছুটো শব্দের মানে ও জানে।

কিন্তু সুকুমার কী-ই বা না বলে। সাধে কি আর ওকে রসিকতার ফেরিওলা বলা হয় !

এটা ঠিক, চাল-চলনে সাবিত্রী বোসের তুলনা নেই।

ওর মতো ঝকঝকে মাজা-ঘষা, হালকা ফিনফিনে শরীর আর কোন মেয়ের? ওর মতো ভুরু কুঁচকোতে, ঠোঁট বাঁকাতে, ঘাড়-ঝাঁকুনি দিতে আর কোন মেয়ে জানে? ওর চলাফেরা বিলিতি ছন্দে বাঁধা; প্রতি পদক্ষেপ ওর দোলা;—তাতে ওর শরীরের নারীত্ব পরিস্ফুটতর হ'য়ে পথচর পুরুষের চিত্তবিভ্রম ঘটায়। একটু উঁচু ক'রে শাড়ি পরার ফ্যাশন ও-ই তো প্রবর্তন করে—এবং বাঙালি মেয়েদের মধ্যে ও-ই প্রথম চুল শিঙ্গল করে—এই সাবিত্রী বোস। সে ১৯২৫ সনের কথা—ওর বয়েস তখন সবে সতেরো। এক বিকেলে কলেজ-ফেরতা মেয়েকে দেখে মা হঠাৎ চিনতে পারলেন না। চিনতে যখন পারলেন, মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে হলো এ তাঁর মেয়ে না-হ'লেই যেন ছিলো ভালো। এমনকি, সাবিত্রীর ব্যারিস্টর বাবাও চট ক'রে মেয়ের এতটা মেমিয়ানা হজম করতে পারলেন না। কিন্তু একমাস না-যেতেই দীর্ঘকেশী এমন হ'লো যে মেয়েকে তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না। এরই নাম অভ্যেস।

সাবিত্রীকে শিঙ্গল মানিয়েছে, এ-কথা সুকুমারকেও মানতে হয়েছে। বাদামি রঙের চুল দু'দিকে ঘণ্টার মতো নেমে এসে ওর ফর্শা ছোটো মুখখানা ঘিরে রয়েছে—সুন্দর ছবির জুটেছে সুন্দর ফ্রেম। ওর চোখে নীল আভা, আর চোখের হাসি নীল জলে রোদের রেখার মতো।

ওর ঠোঁট দুটি পরিপূর্ণ বঙ্কিত, রক্তিম, সমস্ত দেহটি একটি উজ্জ্বল, উদ্ধত, উঙ্কঙ্কিত ছন্দে বাঁধা, যেমন উদ্ধত কৃষ্ণচূড়া চৈত্রের ম্লান-নীল আকাশের তলায়, ঘন সবুজ পত্রগুচ্ছের অন্তরালে। ও যে বিশেষভাবে চোখে পড়বার মতো, তা ও নিজেও কখনো ভোলে না, অন্যদেরও ভুলতে দেয় না।

এই সাবিত্রী বোস অতনুকে কুয়াশার মতো ক'রে জড়িয়ে ধরেছে ; ওকে দেখলে আর চেনা যায় না। সত্যি বলতে কী, ওকে বড়ো একটা দেখাই যায় না। আমার বাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায় যে-আড্ডা বসে, অতনু আজকাল সেখানে প্রায়ই অনুপস্থিত। কদাচ যখন আসে, এমন-একটা ভাব ক'রে আসে, যেন ম্যাকডনাল্ড-সাহেব ওর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ভারতবর্ষকে স্বরাজ দেবার দিনক্ষণ ঠিক ক'রে ফেলেছেন—আমরা হতভাগারা কেউ সে-খবরটা পর্যন্ত জানিনে! কোনো প্রসঙ্গে ওর উৎসাহ নেই। ভিলমা ব্যাঙ্কি কাকে ছেড়ে কাকে বিয়ে করলো ; কাপাব্লাঙ্কার পর কে-কে দাবা খেলায় পৃথিবী জয় করেছে ; বাংলা ভাষা সংস্কৃতর প্রকৃত বংশধর কিনা ;—এমনি সব মরণ-বাঁচন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হ'লেও ও নিজের মনে ঝিমুতে থাকে। ওর কানে কোনো কথাই ঢোকে না, কিম্বা ঢুকলেও কানেই আটকে থাকে, মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছয় না। ফলে ও মাঝে-মাঝে যা দু'একটা কথা

বলে, তা এমন অর্থহীন এবং অবান্তর হ'য়ে পড়ে যে সুকুমার বলতে বাধ্য হয়, 'গর্দভ !' ('গর্ধব' নয়, 'গর্দভ')।

কিন্তু সাবিত্রী বোস যাকে কুয়াশার মতো ঘিরে আছে, তাকে গালাগাল দেওয়া বৃথা। পৌঁছবে না। সেই গাঢ় অন্তরঙ্গতার আবরণ ভেদ ক'রে ওর চোখ বাইরের কোনো জিনিশ দেখতে পায় না, কান পায় না শুনতে। তাই তো সুকুমারের বিদ্রূপ-বাণকে ও ঈষৎ হাসি দিয়ে ফিরিয়ে দেয়—একটু বোকার মতো হাসি, তা ঠিক। না হয় বড়ো জোর আলস্যজড়িত স্বরে বলে, যা-যা:' ;—একটু বোকার মতো বলে, তা ঠিক। এমন পুরুষ কে কে কোথায় আছে যে প্রেমে পড়লে—বা প্রেম পেলে—একটু বোকা হ'য়ে না যায় ?

অতনুর সম্বন্ধে 'প্রেম পেলে' বলাই ভালো ; কেননা, ও কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে পারে এমন সন্দেহ আমরা কেউ করতাম না। ও সাবিত্রীকে সহ্য করে—এ পর্যন্ত। কিন্তু সাবিত্রীর মন রাখবার জন্যে ও যে কখনো একটুখানি রাত জাগবে, বা ধুতির সঙ্গে শার্ট পরবে, বা দুপুরের রোদ্দুরে বাড়ি ছেড়ে বেরোবে, এমন ছেলেই অতনু মিত্র নয়। সাবিত্রীর গৌরব শুধু এইটুকু যে ও অতনুকে সম্পূর্ণ দখল করতে পেরেছে—অতনুর গতিবিধি আজকাল এক-পথবর্তী। এই একনিষ্ঠতার পিছনে কতটা

স্বাভাবিক ক্লান্তি আছে বা থাকতে পারে, এ-চিন্তা সাবিত্রীর মনে আসেনি। সাবিত্রী—হাজার হ'লেও—মেয়ে। ভালোবেসেই ওর সুখ, ওর সুখ সম্পূর্ণ, নিঃসংকোচ, নিঃসন্দেহ আত্ম-সমর্পণে; পিছনে ফিরে তাকাবার সময় কোথায় ওর? কোথায় সময় ওর ভাববার?

তাই, অতনুর সঙ্গে যখনই ওর দেখা হয়, ও প্রথমে অতনুর হাত ধরে, পরে সে-হাতের উপর একটু চাপ দেয়, পরে হাত ছেড়ে দিয়ে ওর (অতনুর) চোখে তাকায়, তাকিয়ে নিচের ঠোঁটের এক কোণ একটু কামড়ে ধরে—তারপর হাসে—ওর চোখের নীল আভায় নীল জলে রোদের রেখার মতো হাসি ঝিকমিক করে। তারপর একবার মাথা-ঝাঁকুনি দেয়—দু'পাশের চুল সোনার ঘণ্টার মতো দুলে ওঠে, রুপোর ঘণ্টার মতো বেজে ওঠে ওর মন।

ঘাসের উপর ছায়ার চলার মতো হালকা ওর ডাক, 'Prince Charming!'

অতনু অনেকটা কর্তব্যের খাতিরে সাড়া দেয়, 'Golden Guendolen! (কেননা, অতনু সাবিত্রীকে বলেছে যে তার চুলের পাকা ধানের মতো রং, যদিও আসলে—কিন্তু কবিতার প্রাণ কি অতিরঞ্জন নয়, এবং প্রেমের প্রাণ কবিতা?)

সাবিত্রী বলে, 'My own!' আর অতনু :

'Love!'

এমনি খানিকক্ষণ প্রণয়-সম্বোধনের বিনিময়, তৃতীয় ব্যক্তির কাছে যার কোনো মানে নেই।

তদন্তে সাবিত্রী বলে, (কোনো এক দিনের কথাই ধরা যাক) 'বৃষ্টি হবে ব'লে মনে হচ্ছে, নেস্‌পা?'

'বৃষ্টি অবশ্যি হ'তে পারে', অতনু জবাব দেয়, সত্যি বলতে কী, বৃষ্টি হওয়া খুবই সম্ভব ; ক'দিন ধরে 'যে-রকম গরম যাচ্ছে, বৃষ্টি হওয়াই উচিত—বৃষ্টি হ'লেই আমরা বেঁচে যাই।'.

'কিন্তু—' সাবিত্রী হেসে ফেলে, কিন্তু, 'মন শের, বৃষ্টি হ'লে আমরা বেরুতে পারবো না, এবং ঘরে বসে থেকে আমরা কী করবো?'

অতনু তার কবিতার জীর্ণ পুঁজি ঘেঁটে ইতিপূর্বে অন্যত্র সে যা আউড়িয়েছে, তারই পুনরাবৃত্তি করে, ""We are in love's hand today, where shall we go?""

সাবিত্রী ইংরেজী সাহিত্যে বি.-এ. পাশ করেছে ; মাছ যেন পুরোনো, পরিচিত জলে ফিরে এসেছে, এমনি ওর আরাম। নীল আভা-ভরা চোখ বড়ো ক'রে বলে, 'Charmant! এই জন্যেই তো Keats has always been my favourite। ভারি languid!—নেস্‌পা?'

'ডার্লিং', অতনু বলতে থাকে, 'কীটস যে তোমার প্রিয় কবি, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহের কারণ নেই ; এবং কীটস যে languid, এ-নিয়েও কেউ তোমার সঙ্গে তর্ক করবে না। যে লাইনটি আমি এইমাত্র বললাম, তাতে এক-আধটু languor'ও থাকতে পারে, কিন্তু তা কীটস-এর নয়। ও-লাইনটি কা'র, তা অবশ্যি আমি বলতে পারবো না, কিন্তু কীটস-এর যে নয় তা তুমি জেনে রেখো।'

সাবিত্রী মুগ্ধ হ'য়ে বলে, 'How clever you are, mon cher! কিন্তু বৃষ্টি যে এলো—what shall we do?'

'বাজাতে পারো। গান করতে পারো। পিংপং খেলতে পারো। নভেল পড়তে পারো। গল্প করতে পারো। চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারো। যা তোমার খুশি। তুমি যা-ই করো, তোমাকে অ্যাডমায়ার করবার লোকের অভাব হবে না—যতক্ষণ আমি আছি।'

সাবিত্রী শুধু বলে, 'Oh!' যে-কথার কিনা নানা রকম ব্যাখ্যা হ'তে পারে। তারপর আবার অতনুর হাত নিজের হাতে নেয়,—এবং তারপর যা হয়, তা আগেই বলা হয়েছে।

এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে ওর প্রতি সাবিত্রীর এই মনঃসংযোগে অতনু উৎফুল্ল, উল্লসিত,

এমনকি, উদ্‌ভ্রান্ত হয়নি। তা হ'লেও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে ওর ঘুম ভাঙেনি, হৃদয় জাগেনি। হ'তে পারে, এই ওর জাগ্রত অবস্থা। ওর মধ্যে আমরা একটি জিনিশ বরাবর লক্ষ্য ক'রে এসেছি,—মজ্জাগত আলস্য, উৎসাহের অভাব। পারস্য বেড়ালের মত ও আরামপ্রিয়। ও চুমো খাওয়ার চাইতে ঘুমোতে ভালোবাসে। আহার-ব্যাপারে পান থেকে চুন খসলে ও মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। শারীরিক কোনোরকম অসুবিধা সইতে পারে না একেবারেই। না-চাইতে ও এত পেয়েছে যে এখন কোনোরকম চেষ্টা বা কষ্ট করতে হ'লে ও মরে যাবে। নিতান্তই যা হাতের কাছে এসে ঠেকে, তা ও দয়া ক'রে মুখে তুলতে পারে, কিন্তু তার বেশি না। এ-ও ঠিক যে ওর হাতের কাছে যত-কিছু এসে ঠেকে, তার সব মুখে তুলতেই ওর সময়ে কুলোয় না—অন্বেষণ বা উপার্জন তো দূরের কথা। এই অতি-প্রাচুর্য ওকে ঢিলে, নরম ক'রে দিয়েছে। প্রবল আবেগ ওর মধ্যে নেই, প্রখর উত্তাপ নেই, ক্ষুরধার উৎসাহ নেই। ও ভদ্র, ও ঠাণ্ডা, ও মধুর। ওকে দিয়ে নেশা হয় না, আরাম হয়। পুরুষের চরিত্রে এর চেয়ে বড়ো গলদ কিছু হ'তে পারে না, কিন্তু মেয়েদের তা আবিষ্কার করতে এত সময় লাগে যে প্রায়ই তার আগেই অতনু স'রে পড়ে, বা স'রে পড়তে বাধ্য হয়।

আর মেয়েরা অত-শত বুঝতে চায়ও না ; ওর চেহারা দেখেই ঝাঁপ দেয়, ওর চেহারাতেই ডোবে। ওর কাছ থেকে যা পায়, তা-ই দু' হাতে কুড়িয়ে নেয়—বিচার করে না, নিজের মন তৃপ্ত হচ্ছে কি-না, তারও সন্ধান নেয় না একবার। অতনুকে পেয়ে ওদের ভ্যানিটি ঠাণ্ডা থাকে ; এবং মনের পরিপূর্ণতার চেয়ে ভ্যানিটির পরিতৃপ্তি যে ওদের কাছে বড়ো জিনিষ তা কে না জানে !

সেই জন্যই তো গোড়াতেই বলা হয়েছে যে এ-গল্পের নায়ক অতনু নয়, অতনুর চেহারা।

৫

এখানে গল্পের দ্বিতীয় পর্বের সুরু ;—কী ক'রে পনেরো বছরের একটি কালো মেয়ের প্রভাব সাবিত্রীরূপিনী কুহেলিকা ভেদ ক'রে সূর্যালোকের মতো তীক্ষ্ণ উষ্ণতায় অতনুকে চঞ্চল ক'রে দিলে—তার ইতিহাস। এই ইতিহাস আমি শুনেছি অতনুর মুখ থেকে, এবং আপনারাও অতনুর মুখ থেকেই শুনবেন। একদিন হঠাৎ বিকেল তিনটের সময় ও এসে উপস্থিত। এর আগে ক্রমান্বয়ে দশ-বারো দিন আমরা কেউ ওর দেখা পাইনি। আড্ডায় তো ও আসেইনি, ওর বাড়ি গিয়েও

ফিরে এসেছি, এবং বার দুই ওকে টেলিফোনে ডেকে ওর মেদিনীপুরনিবাসী ভৃত্যের উড়ে-ঘেঁষা ভাষা শুনে রাগ ক'রে নিশ্চেষ্ট হয়েছি। যাক গে—ও খারাপ নেই, এ-কথা যখন শুনিনি, তখন ভালোই আছে, সম্ভবত খুবই ভালো আছে, আমাদের অনেকের চাইতেই ওর ভালো থাকার কথা। অন্তত, যে-হতভাগ্য শুধু বন্ধুদের প্রেমোপাখ্যান লিপিবদ্ধ করবার জন্যই জন্মেছে, তার চেয়ে যে ও ভালো আছে, এ-কথা নিজের খুব সহজেই বিশ্বাস হয়েছিলো।

অতনু ব'লে কেউ যে পৃথিবীতে আছে, বা কখনো ছিলো, তা প্রায় ভুলে' এসেছি, এমন সময় একদিন শ্রীমান সশরীরে এসে উপস্থিত। তায় আবার বেলা তিনটের সময়, কলকাতা যখন পাঁচ ঘণ্টার একটানা গরমে হাঁপিয়ে উঠেছে। একটু অবাকই হ'লাম। বললাম, 'তুমি তাহ'লে বেঁচে আছো? কলকাতাতেই আছো? বিয়ে কবে করলে? না, এখনো করো নি? নেমন্তন্ন করতে এসেছো?'

অতনু পাখাটা আর-একটু জোরে চালিয়ে দিয়ে খাটের উপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়্‌লো।

জিগেস করলাম, 'কবে বিয়ে?'

অতনু বললে, 'সিগ্রেট দাও।'

জিগেস কর্‌লাম, 'ক' মিনিট থাকবে ? চা খেয়ে যেতে পারবে কি ? না—'

অতনু বললে, 'দেশলাই দাও।'

তারপর সিগারেটটা ধরাবার আগে দু'আঙুলে নাড়াচাড়া করতে-করতে—

'বিভূতি, তোমার কাছে প্রভাত মুখুয্যের গল্পের বই আছে ?'

আকাশ থেকে পড়লাম। প্রভাত মুখুয্যে! গল্পের বই! বাংলা বই! অতনু! শুনেছিলাম বটে, অতনু নাকি কবে একবার বাংলায় এম্‌.-এ. পাশ ক'রে রেখেছিলো, কিন্তু ও যে বাংলা বই পড়ে, ওর সম্বন্ধে এ-হেন খারাপ ধারণা করবার কোনো কারণ এ-অবধি ঘটেনি। বিশেষ আজকাল! সাবিত্রী বোস তো বাংলার আগে শেখে ইংরিজী বল্‌তে, এবং ইংরিজির চেয়ে ভালো জানে ফ্রেঞ্চ্‌।

করুণকণ্ঠে বললাম, 'জেনে শুনে কেন লজ্জা দিচ্ছো, অতনু ? প্রভাত মুখুয্যে যখন লিখতে আরম্ভ করেন, ঠিক সেই সময়ে আমি প্রথম গল্প-পড়ার স্বাদ পাই কিনা; —এখনো মায়া কাটিয়ে উঠতে পারিনি।'

'আছে, তাহ'ল ? গুড্‌! আমাকে এক-এক ক'রে সবগুলো দিয়ো তো।'

'একেবারেই নিয়ে যাও না কেন সব?' উৎফুল্ল স্বরে বললাম, 'এক নিশ্বাসে সব প'ড়ে ফেলতে পার্‌বে।'

মূর্খ আমি, মনে করেছিলাম—এতদিনে বুঝি অতনুর নিজের সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহল হয়েছে! প্রভাত মুখুয্যের রচনা কী-কী কারণে টেঁকসই, তা ওকে বুঝিয়ে ছাড়বো ব'লে পাঁয়তাড়া কষছি, এমন সময় 'আমার জন্যে বই চাচ্ছিনে,' অতনু বললে, 'মনসা-মঙ্গল পড়ার পর থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, বাংলা বই আর ছোঁবো না। ছুঁইও নি।'

আমি কুঁকড়ে একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেলাম। ভয়ে-ভয়ে বললাম, কিন্তু 'সাবিত্রীর তো প্রভাত মুখুয্যে ভালো লাগবে না। বরঞ্চ নরেশ সেনের সাইকো-ক্রিমিনলজিকল উপন্যাসগুলো—'

অতনু বল্‌লে, 'চুপ করো। তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছো নাকি? সাবিত্রী—'অতনু সিগারেটের ছাঁই ঝাড়্‌লে—'সাবিত্রী languid সাহিত্য পছন্দ করে; প্রভাত মুখুয্যে কি languid?'

আমি গম্ভীরমুখে বললাম, 'না। এবং এ-জন্য ঈশ্বরকে শতসহস্র ধন্যবাদ।'

অতনু বললে, 'তা ছাড়া ওর সময় কোথায়? প্রয়োজনই বা কী? বোদলেয়ারের নাম জানলেই যথেষ্ট।'

বোদলেয়ারের আমি নাম পর্যন্তই জানি, তাই নিরুৎসাহভাবে শুধু বললাম, 'হুঁ।'

'বইগুলো', অতনু বললে, 'আমার কী জন্যে দরকার, জিগেস করবে না?'

'আমার কাছ থেকে নিয়ে সবগুলো হারিয়ে ফেলবে আরকি। বুঝতে পেরেছি, আমি আর বাংলা পড়ি, এ-ও তোমার ইচ্ছে নয় ' ব'লে আমি বিমর্ষভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

অতনু দেয়ালকে উদ্দেশ্য ক'রে বললে, 'বুলুকে পড়তে দেবো।'

ইহজীবনে এই প্রথম বুলু-নাম আমার কর্ণগোচর হ'লো। এ-ব্যক্তি আবার কে? অতনুর সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই ও বললো, 'বুলু একটি মেয়ের নাম। ও আমাদের—'

কিন্তু এখানে অতনুর ঘরের কথা একটু ব'লে নিতে হয়।

পরিজনের মধ্যে অতনুর এক বিধবা মা। পূর্ববঙ্গে ওদের বিস্তীর্ণ জমিদারি ছিলো, কিন্তু তা বেশির ভাগই পদ্মায় তলিয়ে গেছে। থাকবার মধ্যে আছে মুক্তারাম রো-তে এক বাড়ি—ওর ঠাকুরদার আমলের; আর ব্যাঙ্কে ওর বাবার সারা জীবনের সঞ্চয়, যা, কোনো ভাই-বোন

না থাকায়, সবই ওর কপালে জুটেছে। বাড়িটা ওদের দু'টি প্রাণীর পক্ষে নিতান্তই বড়ো, তাই ওরা বাধ্য হয়েছে নিচের তলাটা ভাড়া দিতে। অতনু তো অনেক সময়েই বাড়ি থাকে না, এবং সে-সময়টা ওর মা-কে একেবারে একা থাকতে না হয়, এ-ও একটা কারণ। ভাড়াটা নেহাৎই না-নিলে নয় ব'লে ও নেয়; কোনো পরিবার যদি দয়া ক'রে এমনি এসে থাকতো, তাহ'লেই অতনু সব চেয়ে খুশি হ'তো। ভাড়া নিতে আত্ম-সম্মানে লাগে ওর। কিন্তু অন্য লোকেরও তো আত্ম-সম্মান আছে! আর দয়া ক'রে ওর দয়া গ্রহণ করে, এমন লোক যারাও বা আছে, তাদের বাড়িতে থাকতে দেয়া যায় না। সুতরাং ভাড়া নিতেই হয়। এ পর্যন্তই জানতাম; ওদের নিচের তলায় কারা ছিলো বা আছে বা থাকবে, তা নিয়ে কখনো অনুসন্ধান করিনি। তাই, অতনু যখন বললো, 'বুলু একটি মেয়ের নাম, ও আমাদের নিচের তলায় থাকে।' তখন স্বভাবতই ব'লে ফেললাম, 'কিন্তু অ্যাদ্দিন তোমার মুখে এ-মেয়ের নাম শুনিনি তো!'

অতনু বল্লে 'এরা নতুন এসেছে। মাসখানেক হয়। আগেকার ভাড়াটেরা কবেই তো চ'লে গেছে।'

অতনুর মুখের চেহারা দেখে মনে হ'লো, ও যা বলছে, তা যে ওকে মানায় না, ও তা জানে, এবং সে-জন্য ও

লজ্জিত, আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে ও হঠাৎ বলতে আরম্ভ করলো :

'তোমরা হয়তো মনে করো, বিভূতি, মেয়েদের মন নিয়ে পিংপং খেলা আমার নেশা। আমার পক্ষে প্রতিবাদ করা সম্ভব নয়, কেননা facts বলতে যা বোঝায়, তা আগাগোড়া আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। নয় কি ?'

আমি চেয়ারটা খাটের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, 'তা দিচ্ছে।'

'কিন্তু তোমরা যখন আমাকে ঠাট্টা করতে, ভুলে' যেতে যে নেপথ্যে ব'সে আর-একজন আমাকে—কথা দিয়ে নয়, ব্যথা দিয়ে বিদ্রুপ করবার আয়োজন করছে—গ্রীকরা তাকে বলতো 'নেমেসিস্। সম্প্রতি আমার মন নিয়েও খেলা শুরু হয়েছে—এবং সে-খেলা পিংপং নয়। তার চেয়ে অনেক মারাত্মক।'

'তোমার প্রচুর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও,' গম্ভীরভাবে বললাম, 'মেয়েদের মন জানতে তোমার ঢের দেরি। আমি বই-টই লিখি, নারী-চরিত্রে আমার অন্তর্দৃষ্টি'—একটু বিনয় করলাম—'সাধারণের চাইতে একটু বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। মেয়েরা যখন বলে, "কিছুতেই নয়," তার মানে, "এখনো নয়" ; যখন বলে, "না", তা'র মানে,

"হ'তে পারে" ; যখন বলে, "হয়তো," তা'র মানে, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এই মুহূর্ত্তেই" সাবিত্রী মুখেই "হ্যাঁ" বলেছে, সুতরাং তার মানে যে কতখানি, তা ভাবতে আমার সাহস হয় না। অথচ তবু তুমি নার্ভস্ ?'

অতনুকে আমার কথার গভীরতা উপলব্ধি করবার সময় দেবার জন্য চুপ করতেই ও ফোঁশ ক'রে উঠলো, 'Shut up, fool !'

আমি একটু আহত হ'য়ে বললাম, 'আমার কথা যদি না-ই শুনতে চাও—'

অতনু বললে, 'যেন তুমিই আমার কথা শুনছো !'

আমি বললাম, 'শুনছি না ? এতক্ষণ তবে করছিলাম কী ?'

অতনু বল্‌লে, 'এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলে তোমার সাবিত্রী বোস আর আর নারী চরিত্র আর যত রাজ্যের platitudes নিয়ে। Damn the whole lot ! পৃথিবীতে যত রকম লোক আছে, তাদের মধ্যে লেখকরাই ভদ্রসমাজের উপযোগী নয়—ইডিয়টদের কাছে যে-কোনো কথাই তোলো, একটু পরেই ওরা ওদের এলাকায় এসে পৌঁছবে —character বা temperament বা illusion বা এমনি কোনো damned nonsense ! কথা, খালি কথা !'

অতনুর পক্ষে এই উষ্মা স্বাভাবিক নয়। আরো স্বাভাবিক 'damned lot'-এর মধ্যে সাবিত্রীকেও জড়ানো। সন্দেহ হ'লো। ঘোর সন্দেহ হ'লো। প্রথমটায় বিশ্বাস করা অসম্ভব, পরে দুঃসাধ্য, তার পরেও কঠিন।

কিন্তু একেই তো বলে নেমেসিস।

'বুলুকে দেখে প্রথম মনে হয় না (অতনু বলতে আরম্ভ করলো) যে ওর মধ্যে দেখার মতো কিছু আছে। মনে হয় ওর মতো মেয়ে যে-কোনো সাধারণ বাঙালি ঘরে—মানে রান্নাঘরে—মুঠো-মুঠো দেখা যায় ; তারা বড়ো হয়, বিয়ে করে, গোটাকয়েক শিশুর জন্ম দেয়, তারপর আর তাদের সম্বন্ধে কিছু শোনা যায় না। উপরে ওঠবার সময় মাঝে-মাঝে ও আমার চোখে পড়েছে ;— প্রথম কয়েকদিন এটা ওর পক্ষে বেজায় বেয়াদপি মনে হ'তো। মনে হ'তো, ওকে বলি, 'আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করবো, তুমি দয়া ক'রে পাশের ঘরে চ'লে যেয়ো ; আমার চোখ তোমাকে দেখে বড়ো পীড়িত হয়।'

অথচ, জানতাম যে ওর মা-র সঙ্গে আমার মা-র প্রাক্কালে প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিলো, এবং সেই কারণেই আমার মা অনেক গরজ ক'রে ওদের নিচ তলায় আনিয়েছেন, যদিও ওর মা এখন বেঁচে নেই। থাকবার মধ্যে আছেন ওর বাবা, যিনি কর্পোরেশনে চাকরি করেন—কী চাকরি,

তা আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও ভালো বুঝতে পারিনি, —তবে, চাকরি একটা করেন, তা ঠিক। ভদ্রলোক দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন নি, তাই ঘর-সংসার দেখবার জন্যে তাঁর বিধবা দিদিকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। আর আছে মেয়েটির এক ভাই, বড়ো ভাই, সাংঘাতিক বড়ো ভাই। ছেলেটি দু'বার বি.-এস.-সি. পাশ করবার মহান এবং ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে এখন সকালে ডন করে আর বিকেলে বেহালা বাজায়। এর মনের বাসনা মাইনিং শিখতে বিদেশে যাওয়া, কিন্তু বিধি এমনি বাম যে এই সামান্য অভিলাষও নেহাৎই অর্থাভাবে পূর্ণ হচ্ছে না। একে দিয়ে পরে আমাদের দরকার হ'তে পারে, তাই এর নাম ব'লে রাখি—অমূল্য। তোমাকে গোপনে বলছি, বিভূতি, আমার সন্দেহ হয়, অমূল্য ছোকরা অ্যানারকিস্ট দলের একজন। কেন, শুনবে? ও ডন করে আর বেহালা বাজায় ব'লে। ডন করাও ভালো, বেহালা-বাজানোও ভালো, কিন্তু যে লোক ডনও করে, এবং বেহালাও বাজায়, তার পকেটে না থাক পেটে বোমা আছে নিশ্চয়ই। পারতপক্ষে তার কাছে ঘেঁষো না। না তার ছোটো বোনের।

আমার মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অসীম ঔদাস্য প্রদর্শন ক'রে মা যা-হোক এদের নিয়ে মহানন্দে

কালাতিপাত করতে লাগলেন। বিকেলে আমি বাড়ি থাকি না, আর সেই অবসরে মা বুলুকে উপরে নিয়ে এসে নানারূপ আদর-আপ্যায়ন ক'রে সাবেকি বন্ধুতা তুল্‌লেন সার্থক ক'রে। পিসিমাটিও মা-র সঙ্গে জুটে' গেলেন ; দু'জন সমবয়সী হিন্দু-বিধবা একত্র হ'লে পারস্পরিক প্রীতি-সঞ্চার হ'তে দু'দিনও লাগে না, তা তো জানোই।

রাত্তিরে আমি যখন খেতে বসি, মা বুলুর গল্প করেন। ভারি লক্ষ্মী মেয়েটি—যেমন মিষ্টি কথা, তেমনি ঠাণ্ডা মেজাজ। নবযৌবনা মেয়েদের সম্বন্ধে এই গতানুগতিক বর্ণনা শুনলেই আমার গা জ্বালা করে, তাই আমি জলের গেলাশের মধ্যে তাকিয়ে সেখানে সাবিত্রীর ছবি দেখি। মা বলে যান, বরিশালে থাকতে বুলুর মা-র সঙ্গে কী-রকম ভাব ছিলো তাঁর—এক ইশকুলে পড়তেন তাঁরা, বুলুর মা ঐ বয়সেই কী চমৎকার রসগোল্লা তৈরি করতেন, এবং তা খেয়ে তাঁর বাবা (আমার মা-র বাবা) কী ব'লে প্রশংসা করতেন,—বুলুর মা-র বিয়ের রাত্তিরে তিনি (আমার মা) কী ভয়ানক কেঁদেছিলেন, বিয়ের পরেও বহুকাল তাঁরা পত্র-বিনিময় করেছিলেন, এবং তাঁর বিয়ে হ'বার পর বাবা (আমার বাবা) সেই চিঠি নিয়ে কী সব রসিকতা করতেন—ইত্যাদি, ইত্যাদি, আরো ইত্যাদি। প্রৌঢ়া মহিলাদের বাল্য ও যৌবনের স্মৃতি-কথা

শুনলেই আমার হাই আসে, সেই জন্য মনে-মনে আমি সাবিত্রীর মুখ থেকে শোনা হেরেদিয়ার সনেট আবৃত্তি করতাম। হ্যাঁ, সাবিত্রী সত্যি-সত্যি ফ্রেঞ্চ জানে; অন্তত, মনে তো হয় তা-ই।

এক রাত্তিরে বাড়ি ফিরে'ই আমি ভীষণ চ'টে গেলাম। চেঁচিয়ে বললাম, 'মা, তোমাকে একশো দিন আমি আমার টেবিল ছুঁতে বারণ করিনি? অমন ক'রে গুছিয়ে রেখেছো কেন? এলোমেলো না-থাকলে আমি কোনো জন্মেও কোনো বই কি কাগজ খুঁজে পাই না।'

মা বললেন, 'কক্ষনো আমি তোর টেবিল ছুঁইনি। সারা বিকেল তো আমি নিচেই ছিলাম, সন্ধের পর উপরে এসে দেখি, টেবিলের শ্রী ফিরেছে। এ বুলুর কাজ না-হ'য়ে যায় না। এমন খারাপই বা কী হয়েছে, যার জন্যে মেজাজ তিরিক্ষি করতে হয়? ঘরের মধ্যে বারো মাস একটা আঁস্তাকুড় না-থাকলে তোর যদি নিশ্বাস ফেলতে অসুবিধে হয়, তাহ'লে বুলুকে না-হয় ব'লে দেবো, আর যেন তোর টেবিলে হাত না দেয়।'

ভারি অনুগ্রহ যে আমার উপর। লুকিয়ে এসে টেবিল গুছিয়ে দেয়া হয়! কোনদিন হয়তো টেবিলের উপর ফুল-টুলই রেখে যাবে। তাহ'লেই সেরেছে! রাগ ক'রে বই-টই সারা টেবিলে ছড়িয়ে খানিকক্ষণ ব'সে

পড়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন গেছে বিগড়ে, বইয়ে বসবে কী ক'রে? ধুপ্ ক'রে বইটা মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে সে-রাত্তিরের মতো শুতে গেলাম। শুয়ে-শুয়ে ভাবলাম, মাকে কাল ব'লে দেবো, তাঁর সখি-তনয়াকে আমার ঘরে ঢুকতে বারণ ক'রে দেন যেন।

পরের রাত্তিরেও বাড়ি ফিরে দেখি, সেই অবস্থা। শুধু টেবিল নয়, সব সেলফ, আলমারি, চেয়ার, বইগুলো—একেবারে ফার্নিচারের দোকানের বিজ্ঞাপনের মত ঝকঝক করছে। সারা ঘর এমন সাংঘাতিক-রকম পরিষ্কার যে সেটা হাসপাতাল বা বড়ো জোর হোটেল মনে হ'তে পারে—মানুষের বসবাস করবার বাড়ি কিছুতেই নয়। এমন ঘরে নিশ্বাস ফেলতে সত্যি অসুবিধে হয় আমার।

আগুন হ'য়ে ডাকলাম, 'মা!'

মা এলেন।

ক্রোধের আতিশয্যে শুধু বলতে পারলাম, 'আবার!'

মা বললেন, 'আজও বুলু এসে গুছিয়ে গেছে।'

গুছিয়ে গেছে! উদ্ধার করেছে আমাকে!

'—এ-সব কাজে ওর ভারি শখ; এসেই বললে, "কী নোংরা হ'য়ে আছে টেবিলটা। গুছিয়ে রাখবো মাসিমা?" আমি কিছুতেই বারণ করতে পারলাম না,

পারবোও না। করতে হয় তুমি নিজ মুখে কোরো।' ব'লে মা গম্ভীরমুখে নিজের ঘরে চ'লে গেলেন।

মা যতই গম্ভীর হোন গে—আমি প্রতিজ্ঞা করলাম—কাল সকালে আমি মেয়েটাকে গোটা কয়েক কড়া কথা না-শুনিয়ে ছাড়ছি না। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করবার সময় রোজই তো ওকে দেখি—ওদের ঘরের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। প্রত্যেকবারই দেখি। কী যে করে ও ওখানে দাঁড়িয়ে, ভগবান জানেন। এ-ছাড়া সারা বাড়িতে আর কি জায়গা নেই দাঁড়াবার? যা-ই হোক, কাল ওকে...

কিন্তু এমনি আমার মন্দ বরাত, পরদিন সকালে নিচে নামবার সময় ওকে দেখলামই না। ওকে বকতে পারলাম না ব'লে মনে রীতিমতো কষ্ট হ'লো। আজ ওর এমন কী কাজ ছিলো যে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না? আর, আজই যদি না পারলো, তবে এ-ক'দিন ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকবার কী প্রয়োজন ছিলো ওর? আর, মজা এই যে তার পরেও বার দু'-তিন আসা-যাওয়া করলাম, ওকে দেখতে পেলাম না। মনের ঝাল মনেই র'য়ে গেলো।

সেদিন বিকেলেও সাবিত্রীর কাছে যাবো—কোনদিনই বা না যাই! কলেজ স্ট্রীটের মোড় অবধি হেঁটে গিয়ে

ট্যাক্সি নেবার আগে পুরোনো বইয়ের দোকানের সামনে ঘোরাফেরা করছি, এমন সময় ছাত্রাবস্থার এক পরিচিতের সঙ্গে দেখা। লোকটি একটি boor and bore and all that ; পৃথিবীতে এ-শ্রেণীর লোকই বেশি ; পথে-ঘাটে, ট্রেনে-ষ্টীমারে, হোটেলে-থিয়েটরে—সর্বত্র এর জাত-ভাই ওৎ পেতে আছে, সুবিধে পেলেই তোমার জীবন দুর্বহ ক'রে তুলবে। লোকটির নামও আমার মনে ছিলো না, কিন্তু সে শকুনির মত ধুপ্ ক'রে আমার ঘাড়ের উপর এসে পড়লো, এবং কোনো ওজর-আপত্তি না-শুনে আমাকে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেলো Y. M. C. A-তে। শেষ মুহূর্তে আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত আত্মীয়কে অবিলম্বে দেখতে যাওয়ার অনিবার্যতা সম্বন্ধে খানিক বিড় বিড় করলাম—কিন্তু সে-কথা বোধহয় তার কানেই ঢুকলো না—'মেনু'-নির্বাচনে তার মন এম্নি নিবদ্ধ ছিলো। উপায় যখন নেই—চা-ই খেতে হ'লো—অন্তত, খাওয়ার ভাণ করতে হ'লো—for old acquaintance' sake। আমি তো কোনোরকমে পেয়ালায় কয়েক চুমুক দিয়েই খালাশ, কিন্তু সে পট্যাটো-চপ থেকে পুডিং পর্যন্ত কী যে না খেলো, তা জানিনে। ভদ্রতার খাতিরে আমায় ব'সে থাকতে হ'লো—এবং শুনতে হ'লো তার সাহিত্যালাপ—সাহিত্যালাপ—ye gods ! ঠাশা আধ ঘণ্টা পর মুক্তি

এলো ;—আর দু'মিনিট থাকলেই বোধহয় আমি চায়ের পেয়ালার মধ্যে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলতাম।

বেরিয়ে এসে দেখি, আকাশে মেঘ করেছে। পুরোনো বইয়ের দোকানে ম্যানগানের কবিতার বই দেখে রেখে এসেছিলাম ; কিনতে গিয়ে দেখি, পকেটে একটি পয়সা নেই। বাড়ি থেকেই নিয়ে বেরোইনি। ভাগ্যিশ এখনি ধরা পড়লো! কিন্তু কী আপদ! একেই দেরি হ'য়ে গেছে, তার উপর আবার বাড়ি ফির্‌তে হবে। মন খারাপ ক'রে জোব-এর মতো আমার জন্মের দিনকে অভিশাপ দিলাম, তার পর বাড়ির দিকে দ্রুত পা চালালাম। এদিকে বৃষ্টিও বুঝি এলো।

তুমি তো জানো, বিভূতি, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই সামনের ঘরটি আমার বসবার ঘর। তার এক পাশে আমার শোবার ঘর, অন্য পাশে দু'টি ছোটো ঘর নিয়ে মা'র রাজত্ব। তিন লম্ফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ধাঁ ক'রে ঘরে ঢুকেই আমি যা দেখলাম, তাতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হ'লো। কিন্তু, মনে রেখো, তিন-চার সেকেণ্ডের বেশি দাঁড়িয়ে ছিলাম না। ঐ অল্প সময়ে আমি যা দেখে নিলাম, বিভূতি, তা তোমার কাছে বর্ণনা করতে অনেক বেশি সময় নেবে।

মেঝেতে ব'সে (মানে, মেঝের উপর—পাটি বা মাদুর

কিছু না-বিছিয়ে) মা একটি মেয়ের চুল বেঁধে দিচ্ছেন। মেয়েটি মেঝের উপর দু'টি পা পাশাপাশি রেখে হাঁটু উঁচু ক'রে বসেছে, হাঁটুর একটু নিচে দু'টি হাত এসে মিলেছে—আঙুলে আঙুল জড়ানো। তার এক হাতে বালা। কোলের উপর শাড়ির আঁচলের স্তূপ প'ড়ে আছে—গায়ে পাতলা শাদা ব্লাউজ, মাথা একটু পিছনে হেলানো, তাতে গলা আর থুত্‌নি স্পষ্ট ফুটেছে। কালো চুলগুলি কোমর পর্যন্ত এসে পড়েছে—একটি গোছায় সবগুলো চুল ঘাড়ের নিচে রিবন দিয়ে বাঁধা। মা চুলের নিচের দিকটা আঁচড়াচ্ছেন। এত জিনিশ যে আমার চোখে পড়েছে, তা তখন বুঝতে পারিনি, পরে ভেবে মনে হয়েছে। তখন, হঠাৎ দেখা মাত্র, আমার মনে পড়লো কার যেন আঁকা Circe-র একটি ছবি, বসার ধরন সেই রকম, তেমনি পাংলা শরীর, সেই কালো চুলের গোছা, পেছন দিকে হেলানো মাথা—গলা আর থুতনি—একটু চোখা, একটু শক্ত থুত্‌নি। মেয়েটির রং অবিশ্যি কালো; কালো, কিন্তু নির্মল। মনে রেখো, বিভূতি, তিন কি চার সেকেণ্ড মাত্র আমি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভেবে দেখছি, চারের চাইতে তিন সেকেণ্ড হওয়াই সম্ভব।

এরই মধ্যে মা বললেন, 'কী রে? ফিরে এলি যে?'

আমি এগিয়ে গিয়ে দেরাজ খুলে কয়েকটা টাকা

পকেটে ফেলে দেরাজটা আর বন্ধ না-ক'রেই ছুটে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় মা বললেন, 'আবার বেরুচ্ছিস নাকি ? এক্ষুনি বৃষ্টি আসবে কিন্তু।'

আমি মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'আসুক বৃষ্টি, বেরোতে আমাকে হবেই।'

মেয়েটির দিকে আড় চোখে একবার না-তাকিয়ে পারলাম না। আমি যখন দেরাজ থেকে টাকা নিচ্ছিলাম, সেই ফাঁকে ও কোল থেকে আঁচলের স্তূপ তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়েছে—বাঙালি মেয়েরা যেমন জড়িয়ে থাকে। এবার আর ওকে অতটা Circeর মত লাগলো না।

কোনো মেয়ের দিকে তুমি যত আড়চোখেই তাকাও, কী ক'রে যেন সে টের পেয়েই যায়। ও-ও পেলো। এবং মুখটা এমনভাবে ঘুরিয়ে নিলে, যাতে ওর একটি কান এবং ঘাড়ের এক টুকরোর বেশি আমার চোখে না পড়ে।

আমার উচিত ছিলো, আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো, ও-কথা ব'লেই, চোখের পলক ফেলবার সময় না-দিয়েই বেরিয়ে যাওয়া। কিন্তু মেয়েটিকে দেখতে গিয়ে একটু দেরি হ'য়ে গেলো। আর সেই সুযোগে মা হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌লেন, 'এই তো বুলু। তোমার ওকে যা বলবার আছে, অতনু, তা এখন বলতে পারো। বুলু, অতনু তোকে বকবে।'

বুলু মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাতে গিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। ওর কপাল, গলা, কান সব এমন টুক্‌টুকে লাল হ'য়ে উঠ্‌লো যে বেচারার জন্য আমার কষ্টই হ'তে লাগলো।

এ-অবস্থায় কিছু-একটা না-বলা অস্বস্তিকর, তাই আমি অন্য দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখন আমার সময় নেই, মা। এক্ষুনি যেতে হবে—' ব'লে আমি আর-একবার পা বাড়ালাম, কিন্তু মা বললেন—

'এই, বৃষ্টি এসে গেছে। একটু পরে যাস।'

সত্যি-সত্যি তখন হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে বৃষ্টি এসে পড়লো। কিন্তু প্রিয়া যার জন্য উৎসুক হৃদয়ে প্রতীক্ষা করছে, বৃষ্টিতে তার ভয় কী। রাস্তায় বেরুলেই তো ট্যাক্সি পাবো। তা-ই বেরোবো কিনা, ভাবতে লাগলাম, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবতেই লাগলাম। আশ্চর্য এই, শুধু ভাবলামই।

বুলু বললে, 'আজ আর চুল না বাঁধলাম, মাসিমা; আমি যাই।'

মা বললেন, 'যাবিই তো। চুলটা চট ক'রে বেঁধে দিচ্ছি।' ব'লে তিনি ক্ষিপ্রহস্তে কয়েকটা বেণী তৈরী ক'রে ফেললেন।

বুলু আবার আপত্তি করার চেষ্টা করলে, 'বাবা হয়তো এক্ষুনি আপিশ থেকে ফিরবেন।'

মা ধমকালেন, 'চুপ থাক।'

এদিকে বৃষ্টির মনে বৃষ্টি হচ্ছেই।

মা বললেন, 'বুলু, অতনুর টেবিলের উপর বই-পত্র ছত্রখান হ'য়ে ছড়িয়ে না-থাকলে ও কোনোজন্মে কোনো জিনিশ খুঁজে পায় না—'

আমি ডাকলাম, 'মা!'

'—শুনে অনেকেরই বিশ্বাস হয় না, কিন্তু সত্যি-সত্যি এ-ই ওর অভ্যেস। তাই তো আমি কোনোকালে ওর টেবিলে হাত দিইনে—'

বুলুর মুখ আবার টুকটুক করতে লাগলো।

আমি তাড়াতাড়িতে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোমার ইচ্ছে হ'লে—ভালো লাগলে—যত খুশি আমার টেবিল গুছিয়ো। অভ্যেস বদলাতে আর ক'দিন!'

মা বললেন, 'এখন যে ভালোমানুষ সাজা হচ্ছে বড়ো! না রে, বুলু, তুই ওর টেবিলে হাতই দিসনি; ভদ্রতার কথায় কি বিশ্বাস করতে আছে! পরে, রাত্তিরে আমার উপর তম্বি না করেছে তো কী বললাম!'

বুলু আরম্ভ করলো 'আমি আগে জানলে—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'মা-র কথা তুমি একদম কানেই তুলো না।'

মা বললেন, 'এই অতনু, জলটা বুঝি ধরলো;

যেতে হয়, এই ফাঁকে যা—আবার কখন আসে ঠিক কী ?'

যাবো ? কোথায় যাবো ? ও, হ্যাঁ, সাবিত্রীর কাছে। হঠাৎ—এক মুহূর্তের জন্য—মনে হ'লো, সাবিত্রীর সঙ্গে দশ লক্ষ বছর ধ'রে মেলামেশা করছি, অ্যাদ্দিনে শ্রান্তি আসা উচিত, একটু বিশ্রাম দরকার। মনে রেখো, বিভূতি, এক মুহূর্তের জন্য এ-কথা মনে হ'লো; তারপর আর নয়। কিন্তু বৃষ্টিটারও কী মাথা-খারাপ! হুড়মুড় ক'রে এসে দু' মিনিটের মধ্যেই আবার চট ক'রে থেমে গেলো। আশ্চর্য! এত অল্প সময়ের মধ্যে বৃষ্টি থেমে যেতে আমি আর কখনো দেখেছি ব'লে মনে পড়লো না। তাছাড়া, বেশ খানিকক্ষণ ধ'রে বৃষ্টি হ'লে শহরের লোক বাঁচতো—যে গরম যাচ্ছে! এতে আমার অবশ্যি সুবিধে হয়েছে, কিন্তু বৃষ্টিটারই বা এ-রকম রসিকতা করবার মানে কী? এ-রকম ফাজিল বৃষ্টির জন্য মানুষ কৃতজ্ঞ হয় না, ক্রুদ্ধ হয়।

সাবিত্রী সেদিন কথা বলতে-বলতে বার-বার বলছিলো, 'But you aren't listening, mon cher!' ওর সব কথার মধ্যে—আমি যে কিছু শুনছি না, ওর এই অভিযোগই আমি বার-বার শুনছিলাম। আশ্চর্য!

এক হিশেবে, (অতনু ব'লে চললো) বুলুর মতো মেয়ে যে আমাকে অভিভূত করবে এ অত্যন্ত স্বাভাবিক, এমনকি, অনিবার্য। দু'জনে যখন টগ-অব-ওআর হ'তে থাকে, তখন খানিকক্ষণ খুব জোরে টেনে রেখে হঠাৎ ছেড়ে দিলে বিপক্ষ দ্বিগুণ বেগে উল্টো দিকে ছিটকে পড়বেই। যারা সাধারণ বাঙালি ঘরের মেয়ে দেখে অভ্যস্ত, তাদের কাছে বুলুর কোনো আকর্ষণ নেই। তারা সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করে যে যে-কোনো রান্নাঘরে মুঠো-মুঠো বুলু পাওয়া যায়। বোকারা এটাও বোঝে না যে তা-ই যদি হ'তো, তাহ'লে আমরা সব নিজেদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে রান্নাঘরের স্যাঁৎসেতে মেঝেয় কোঁচার খুঁট বিছিয়ে শুয়ে পড়তাম। আর নড়তাম না।

কিন্তু আমি ছেলেবেলা থেকে যে-শ্রেণীর মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে এসেছি, সাবিত্রী বোসকে তাদের প্রতিনিধি—এবং যোগ্য প্রতিনিধি—ব'লে ধরা যেতে পারে। তাই বুলু আমার কাছে এসেছে অপরিচিতের বিস্ময় নিয়ে, অভিনবত্বের কৌতূহল-সঞ্চার নিয়ে। ও অন্য দেশের—এমনকি, অন্য গ্রহের—লোক ; ওর চাল-চলন আমি ঠিক বুঝি না। ওর চোখ যে-ভাষা বলে, তা কোনোকালে হয়তো জানতাম, কিন্তু অনভ্যাসে ভুলে' গেছি। ওর সঙ্গে যে-খেলা খেলতে হবে, তার নিয়ম-

কানুন আমার জানা নেই, চট্ ক'রে আন্দাজ করতেও পারছি না। তাই তো, ও হচ্ছে প্রথম মেয়ে, যার মুখের দিকে একেবারে সোজা তাকাতে পারিনি—কোথায় যেন বেধেছে। ও হচ্ছে প্রথম মেয়ে, যাকে দেখতে পেলে আমার বুক ঢিপঢিপ করেছে—সত্যি-সত্যি করেছে। উপন্যাসের পৃষ্ঠার বাইরেও যে কোথাও বুক ঢিপঢিপ করে, তা এতদিন আমার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত ছিলো।

বুলু হচ্ছে প্রথম মেয়ে, যাকে আমি মনে-মনে আকাশের তারার সঙ্গে তুলনা করেছি। কথাটা কবিত্ব হ'লেও সত্য। মানে, সাবিত্রী বোস (প্রতিনিধি-হিশেবে) কিছুতেই তারার সঙ্গে উপমেয় নয়; কারণ, আকাশের তারার চাইতে ও অনেক বেশি উজ্জ্বল। ও তীব্র সর্চ-লাইট; ওর আলো ঘুরে-ঘুরে চারদিক থেকে পড়বে তোমার উপর; অত্যুগ্র দীপ্তিতে তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হবে—তোমার মনের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে, হৃদয়ের হৃদয়ের মধ্যে। সম্পূর্ণ ক'রে দেখে নেবে, তোমাকে বুঝে নেবে। কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারবে না, কোনো ছদ্মবেশই টিঁকে থাকবে না। তোমার চোখ দেবে ধাঁধিয়ে, স্বাভাবিক দৃষ্টি নেবে হরণ ক'রে—অনেকক্ষণ পর্যন্ত অন্য দিকে তাকিয়ে আর-কিছুই দেখতে পাবে না। সাবিত্রী রাতকে দিন ক'রে দেয়, ছুই হাতে অন্ধকার

ঠেলে সরিয়ে নিয়ে চলে—কোথায় লাগে ওর কাছে আকাশের তারা!

কিন্তু বুলুকে যেদিন তুমি সত্যি-সত্যি দেখতে পাবে, তোমার জীবনের সে এক প্রকাণ্ড আবিষ্কার। সেদিন তুমি মনে-মনে বলবে, এ-মেয়েটি আকাশের তারা, সন্ধ্যার তারা, সন্ধ্যাতারা। তেমনি নরম এর আলো—ঘুমের মতো, মোমের আলোর মতো নরম আলো। তেমনি ঠাণ্ডা—দেখলেই সন্ধ্যার শিশির মনে পড়ে। প্রায় তেমনি সুদূর। ওকে কোনোদিন হাতের মুঠোয় পাওয়া অসম্ভব নয়, জানি; কিন্তু সম্ভব ব'লেও বিশ্বাস্ হ'তে চায় না। ও কোনো প্রশ্ন করে না, শুধু চোখ মেলে' তাকিয়ে থাকে। ওকে কোনো প্রশ্ন করা যায় না, শুধু চোখ মেলে দেখতে হয়। কবিরা যে তারা বলতেই প্রিয়া বোঝেন কেন, তার কারণ আজ বুঝতে পারছি।'

তুমি এ-সব কথা বলতে কিনা, বিভূতি, তা তুমিই জানো, কিন্তু আমি বলেছিলাম। একটি কবিতার কথা বার-বার মনে পড়েছে, সেই একটি তারার কবিতা—

What matter to me if their star is a world?

Mine has opened it's soul to me; therefore I love it.

৬

চা শেষ হ'য়ে গেলে আমি বললাম, 'হায় অতনু, তোমার কপালে এ-ও ছিলো!'

অতনু ফ্যাকাশে হেসে বললে, 'এ আর কী? শোনোই না।'

শুনলাম। আপনারাও শুনুন।

তারার উপমা মনে রেখো, বিভূতি, (অতনু বলতে লাগলো), কাজে লাগবে। তারাকে শুধু দেখেই তৃপ্তি; ওকেও চোখে দেখবো, এর বেশি উচ্চাভিলাষ আমার প্রথমটায় হয়নি। ওকে চোখে দেখাই একটা অভিজ্ঞতা, সম্মোহন, উন্মাদনা। ওর দিকে তাকালে তোমার শরীর জুড়িয়ে যাবে।

তাই যতবার সম্ভব ওকে দেখবার চেষ্টা চলতে লাগলো। ব্যাপারটা শুনতে যত সহজ, কাজে ততটা নয়। সাধারণ হিন্দুপরিবারের কাণ্ড-কারখানা তো জানো না, বিভূতি,—না, তুমি তো জানোই;—জানোই তো, ওদের মনে সন্দেহ আছে যে মেয়েরা কর্পূর, বাইরে একটু রেখেছো কি উবে হাওয়ায় হারিয়ে গেছে। আমি বহু প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসৃত ক'রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার কঠিন বিদ্যা আয়ত্ত করেছি, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তা কোনো

কাজেই লাগে না—কারণ, বাধা আসে অন্য দিক থেকে। অথচ, ঐ দিক থেকে যে আদৌ বাধা আসে, এবং সে-বাধা যে এই ধরনের হয়, তা আমি জানতাম না। ঘাবড়ে গেলাম।

সারা বাড়িতে শুধু একটি জায়গা আছে, যা দু' পরিবারের এলাকার মধ্যেই পড়ে ; সিঁড়ির গোড়া থেকে বাইরের দরজা পর্যন্ত প্যাসেজ টুকু। ওখান দিয়ে যেতে ওদের দরজা পেরোতে হয়, এবং আগেই বলেছি, সেই দরজার কাছে বুলুকে প্রায়ই দেখা যেতো। এখন আমার জীবনের উদ্দেশ্য হ'লো দিনের মধ্যে অগুনতিবার সেখান দিয়ে আসা-যাওয়া করা—মানে, বাইরে গিয়ে একটু পরেই আবার ফিরে আসা। মিছিমিছি এতবার যাওয়া-আসা করা ভালো দেখায় না, (দেখতে পাচ্ছো, বিভূতি, কোনটা ভালো দেখায় বা না দেখায়, সে-বিষয়ে আমার টনটনে জ্ঞান হয়েছে), তাই আমি নিজে গলির মোড়ের মুদি-দোকান থেকে এটা-ওটা আনতে লাগলাম। মা তো অবাক!

মা আরো অবাক হলেন, যেদিন আমি খড়ম প'রে বাড়িতে চলা-ফেরা করতে লাগলাম। মা-কে বললাম 'আমার এক বন্ধুর খড়মের ফ্যাক্টরি আছে। সে এ-জোড়া আমাকে উপহার দিয়েছে—দেখি প'রে।'

মা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'খড়মের ফ্যাক্টরি !'

আমি বললাম, 'মানে, দোকান আরকি !' ব'লে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দিলাম।

ফ্যাক্টরিই হোক আর দোকানই হোক, খড়ম-পরা আমার চলতে লাগলো। অতিরিক্ত উৎসাহে খট্‌খট্ করতে-করতে নিচে নামি। আগে থেকে নোটিশ দিই—বুঝতেই তো পারছো ! এবং এ-কৌশল কাজেও লেগেছে। কোনোবারই কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার করার ক্লেশ বৃথা যায় না। বুলু ঠিক দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়—চোখোচোখি হয়—আমার বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে। আমি তোমাকে বলতে পারি, বিভূতি, বুলু খড়মের খটাখটের জন্য কান পেতে থাকে। ও যদি স্কচ মেয়ে হতো, তাহলে হয়তো গুন গুন ক'রে গান করতো।

Tho' father and mither and a' should gae mad,
O whistle, and I,ll come to ye, my lad.

আমাদের দেশে এ-উদ্দেশ্যে শিষ-দেয়া রীতি-বিরুদ্ধ, তাই খড়মকে শরণ করতে হয়। তাছাড়া, শিষ দিতে আমি পারিও না।

এত-সব কাণ্ড-কারখানা করতে হ'লো, সহজভাবে মেলা-মেশা করা সম্ভব নয় ব'লে। বিকেলে যে ওকে আমাদের ঘরে স্বচ্ছন্দে যেতে দেয়া হয়, তার কারণই এই

যে আমি তখন বাইরে থাকি। দু'একদিন বাড়ি থেকে না-বেরিয়ে দেখেছি, বিভূতি, বুলু আসেনি, বা এসেই চ'লে গেছে—এবং মা-ও গেছেন সঙ্গে। তখন বাধ্য হ'য়ে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হয়, বাধ্য হ'য়েই যেতে হয় সাবিত্রীর কাছে।

ক্রমে আমি উপলব্ধি করলাম যে আকাশের তারার সঙ্গে হয়তো বুলুর সামান্য একটু পার্থক্য আছেও বা। বুলুকে নিছক চোখে-দেখা কম কথা নয়, কিন্তু ওর সঙ্গে আলাপ করা তা--কে জানে ?—হয়তো আরো বেশি। দৃষ্টি-বিনিময় এক. রকম চলছিলো, কিন্তু বাণী-বিনিময়ের বাসনা হৃদয়ে যখন প্রবল হ'লো, তখনই সম্যকরূপে বিপদগ্রস্ত হ'লাম।

একদিন সকাল থেকে আমি গ্রমোফোন চালাতে লাগলাম। প্রতি মুহূর্তে আশা করছি, এক্ষুনি বুলু এসে পড়বে, এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হ'লো যে নিচে থেকেও গ্রামোফোন শোনা যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা গানের মাঝখানেই রেকর্ড তুলে নিলাম। এখানটায় তুমি সত্যিই বলতে পারো, বিভূতি, 'হায় অতনু, তোমার কপালে এ-ও ছিলো।'

বেরোবার মুখে, বাইরে থেকে এসে উপরে যাবার আগে একটু দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ

করবার চেষ্টা করেছি—কী আলাপ, তা আর না-ই শুনলে, বিভূতি। কিছু বলা নেই, কওয়া নেই—যেন মাটি ফুঁড়ে' আবির্ভূত হয়েছেন সেই অ্যানারকিস্ট দাদা—এসে এক গাল হেসে আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। সে-আলাপও কি যে-সে আলাপ! ব্রডকাস্টিং-এ সভ্যতার কতখানি উন্নতি হয়েছে, অবশ্যি একে যদি আদৌ উন্নতি বলা যায়; মুসোলিনির সঙ্গে নেপোলিয়নের তুলনামূলক সমালোচনা; নেপচুনের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে ক' বছর (বা ক'শো, বা ক' হাজার বছর—সংখ্যাটা আমার ঠিক মনে নেই) লাগে।···হে ঈশ্বর!

ছোকরার এ-সমস্ত সদালাপের কারণ যে আমার প্রতি দুর্নিবার প্রীতি নয়, তা বোঝা অবশ্যি শক্ত নয়। বুঝলে, বিভূতি, আমার সুন্দর চেহারা আমার কাল হ'লো। আমার চেহারা-সম্বন্ধে অ্যানারকিস্ট-ছোকরার ভয় আছে। অবশ্যি এ-কথাও ঠিক, বুলু যে প্রথম থেকেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো, তা-ও আমার চেহারা দেখ্‌তে আমাকে দেখতে নয়। তবু, মরার পর যদি কখনো স্বর্গে যাই, এবং স্বর্গে গিয়ে যদি ভগবানের সঙ্গে দেখা হয়, তাহ'লে আমার চেহারা নিয়ে এমন বিশ্রী বাড়াবাড়ি করবার জন্যে খুব একচোট ঝগড়া ক'রে নেবো। চেহারাটা সাধারণরকম হওয়াই ভালো, তাহ'লে ভালোবাসা

একেবারে সোজাসুজি জায়গায় পৌঁছয়—অবশ্য, তোমার মতো অতটা সাধারণ না-হ'লেও আমার আপত্তি নেই, বিভূতি।

এতদিনের মধ্যে আজ সকালবেলা ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হ'লো—মানে, আলাপ বলা যায়, এমন। আশ্চর্যের বিষয়, ও নিজেই এসেছিলো। ওর সংকোচ অনেক কমেছে; কথায়-কথায় আর লাল হ'য়ে ওঠে না। বরং, কথায়-কথায় হাসে। কখনো বা চেঁচিয়েও হাসে। ওর এই উচ্চহাসি আমি মুখস্থ ক'রে রেখেছি, ইচ্ছে করলেই শুনতে পাই। অমন হাসি তুমি জীবনে শোনোনি, বিভূতি।

ও এসে হাসিমুখে জিগেস করলে, 'আপনার কাছে কোনো বই আছে?'

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে আমি থতমত খেয়ে গেলাম। একটু পরে বললাম, 'বই ছাড়া আর-কিছুই নেই, বলতে পারো। তুমি তো দেখেইছো।'

'দেখেছি। কিন্তু সবই তো ইংরিজি। কোনো বাংলা বই নেই—যা পড়া যায়?'

হঠাৎ মাতৃ-ভাষার প্রতি অসীম মমতা অনুভব করলাম। সত্যি আমরা যদি বাংলা বই না কিনি, কে কিনবে? আর লেখকদেরই বা চলবে কেমন ক'রে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে শেলফের দিকে এগোলাম। 'খুঁজে দেখি।'

বুলু বললে, 'আমি অনেক খুঁজে দেখেছি, নেই। একখানাও নেই।'

আমি বললাম, 'তুমি চাও? পড়তে চাও?'

'খুব।'

আমি হঠাৎ জিগেস করলাম, 'অমূল্যবাবু কোথায়?' জিগেস করাটা বোধ হয় বেখাপ্পা হ'লো, তবু করলাম।

'দাদা ব্যারাকপুরে বেড়াতে গেছেন। ও-বেলা ফিরবেন।'

'ও, তাই।—যাক।'

বুলু টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলো; আমি টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বোসো চেয়ারটায়।'

'এ-ই বেশ আছি।'

'বোসো না!'

'না—এক্ষুনি আবার যেতে হবে কিনা। পিসিমা—'

'আচ্ছা থাক, না-ই বসলে। আচ্ছা ইস্কুলে পড়ো না কেন?'

'আগে পড়তাম। তারপর মা—'

'বুঝেছি। তোমাকে ঘরের কাজকর্ম করতে হয় বুঝি খুব?'

'খুব আর কী—পিসিমাই তো আছেন।'

'রান্না করো ?'

'রাত্তিরে মাঝে-মাঝে করতে হয় ; পিসিমা বিধবা-মানুষ—'

'বুঝেছি। ভালো রান্না করো ?'

'আপনি জানলেন কী করে' ?'

'জানিনে ব'লেই তো জিগেস করছি, ভালো রান্না করো কিনা।'

বুলু চুপ ক'রে রইলো।

কথা-বলায় আমার অসাধারণ নৈপুণ্য লক্ষ্য কোরো, বিভূতি। পাছে বুলু এখনই চ'লে যায়, সেই ভয়ে আমি চট ক'রে আবার কথা পাড়লাম।—'তোমার ইস্কুলে পড়তে ইচ্ছে করে ?'

'খুব।'

'ইস্কুলে না পড়লেও অনেক জিনিষ শেখা যায়। যায় না ?'

'খুব।'

'খুব।' কথাটার অতি-ব্যবহার লক্ষ্য কোরো, বিভূতি। ওর মুখে কথাটার মানে অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু তা বুঝতে হ'লে আবার ওর মুখে শোনা দরকার।

'তুমি শেলাই করতে পারো নিশ্চয়ই ?'

'শেলাই কে না পারে!'

'ছবি আঁকতে?' (আমার বাকনৈপুণ্য লক্ষ্য কোরো, বিভূতি, একটু ফাঁক যেতে দিচ্ছি না।)

'না।'

'একটুও না।'

'একটুও না।'

'আমার আলমারিতে যে-ছবির বইগুলো আছে, দেখেছো?'

'দু'একটা নেড়ে-চেড়ে দেখেছি।'

'কেমন?'

'বড়ো বেশি—'বুলু হঠাৎ থেমে গেলো।

'বুঝেছি।' (আশা করি, বিভূতি, তুমিও বুঝেছো।)

বুলু ছেঁড়া জায়গায় চমৎকার তালি দিলে, 'বেশ সুন্দর ছবিগুলো।'

আমি সুযোগ পেয়ে বললাম, 'ছবি যাঁরা আকেন, তাঁদের কী অদ্ভুত ক্ষমতা ভাবতে পারো? আচ্ছা, বুলু, কোনো দেবতা যদি তোমাকে একটি—শুধু একটি—বর দিতে চান, তাহ'লে তুমি কী চাও?'

বুলু মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইলো।

'এমন-কোনো সাংঘাতিক ইচ্ছে নেই তোমার?'

বুলু এবার পালানো জবাব দিলে, 'কোনো দেবতা আসবেনও না, বরও চাইতে হবে না।'

'কিন্তু তবু—ধরো, যদিই আসেন।'

এমন সময় নিচে থেকে পিসিমার ডাক এলো—'বুলু।'

বুলু বললে, 'আমি যাই।'

বললাম, 'এসো। তোমার জন্যে বিকেলে বই নিয়ে আসবো আমি।'

আর এই কারণেই, বিভূতি, তোমার কাছে আমার আসা। একবার ভাবলাম, বই কিনেই দিই, কিন্তু আনকোরা নতুন বই দেখে পাছে কেউ কিছু—বুঝলে না? সমীচীনতার জ্ঞান আজকাল আমার বড়োই টনটনে হয়েছে কিনা। একখানা ক'রে দেবো, প্রত্যেকটি বই দিতে এবং নিতে—বুঝলে না? দাও একখানা বই। যাই।

আমি বললাম, 'তা দিচ্ছি, কিন্তু সাবিত্রী?'

অতনু বললে, 'সাবিত্রীকে বলেছি, আমি বাংলা শব্দ-তত্ত্ব নিয়ে একখানা বই লিখছি—চাইকি, এর জোরে ডি.-লিট.ও হ'য়ে যেতে পারি। সেই জন্য অত ঘন-ঘন দেখাশোনা করা আর সম্ভব হবে না। করুণ ক'রেই বলেছি কথাটা। বিকেলে বাড়ি থেকে না-বেরুতে পারলেই বাঁচি, কিন্তু একেবারে ঘরে ব'সে থাকাটাও অশোভন, তাই

গোলদিঘির দিকে একটু ঘোরাঘুরি ক'রে সন্ধে উৎরোতেই ফিরে আসি। এসে বইপত্র ছড়িয়ে গম্ভীরমুখে বসি। ডি.-লিট.-এর কথাটা মা-কেও বলতে হয়েছে কিনা।

আজকাল অতনুর দেখা প্রায়ই পাই ; দু' তিন দিন পর-পরই একখানা বই ফিরিয়ে দিয়ে আর-একখানা নিয়ে যায় এসে ; বেজায় হাসিখুশি। অজস্র কথা বলে ; কেউ যখন আশা করে না, ঠিক সেই সময়ে অদ্ভুত সব রসিকতা করে, সুকুমারের সঙ্গে টেক্কা দেয়। বেশিক্ষণ থাকে না বটে, কিন্তু যতক্ষণ থাকে—একেবারে ঠাশা, জমাট। ওর মধ্যে এই চাঞ্চল্য একেবারে অপূর্ব। ওর নদীতে এতকাল স্রোত ছিলো না ; কিন্তু হঠাৎ আকাশের সব কোণ থেকে জেগে উঠেছে হাওয়া, তাই তো জলে এত ঢেউ।

৭

বুলুর সঙ্গে অতনুর আলাপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। কোনো দেবতা এসে যদি ওকে একটিমাত্র বর দিতে চান, তাহ'লে বুলু কী চাইবে, তা ও মনে-মনে ঠিক ক'রে রেখেছে। এখন দেবতা এলেই হয়।

সুবিধে পেলেই বুলু উপরে এসে অতনুর সঙ্গে খানিক গল্প ক'রে যায়। সুবিধে পেলেই—মানে, ওর অ্যানার-

কিস্টদাদা। (অবিশ্যি ভদ্দরলোক আসলে অ্যানারকিস্ট না-ও হ'তে পারেন, কিন্তু হ'তেও তো পারেন—কে জানে?) বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেলেই। দাদাকে ওর বড়ো ভয়। এতেই বোঝা যায়, কোনটা ভালো দেখায় আর কোনটা দেখায় না, এ-বিষয়েও ওর কম টনটনে জ্ঞান নয়। আমরা যদি পাপ-পুণ্যে বিশ্বাস করতাম, তাহ'লে বলতাম যে বুলুর মনেও যে পাপ আছে, এ-ই তার প্রমাণ।

বুলু সবে যৌবনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে; এখন পর্যন্ত ও শুধু শিখেছে অনুভব করতে, বিশ্লেষণ করতে নয়; ও যাকে ভালোবাসবে, তাকে শুধু ভালোই বাসবে, যাচাই করবে না; দূর থেকে পূজো করবে, কাছে এসে পরখ করবে না। তাই তো, অতনুকে ও প্রথম যেদিন দেখলো, বুকের মধ্যে ওর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠলো—রুদ্ধস্বরে ও বললে, 'কী সুন্দর।' তাই তো, অতনু প্রথম যেদিন ওর সঙ্গে কথা কইলো, ওর বুকের মধ্যে একটা পাখি উঠ্‌লো গান ক'রে, আর সেই পাখির গান শুনে-শুনে ওর রাত গেলো ভোর হ'য়ে, ঘুম এলো না।

একদিন অতনু জিগেস করলে, 'বুলু, তুমি চা খাও?'

'খুব।'—একটু থতমত খেয়ে—'খুব খেতাম।'

'এখন?'

'এখন ছেড়ে দিয়েছি। আর তো কেউ খায় না। মা খুব চা খেতেন কিনা—'

'ও, বুঝেছি। তোমার দাদাও খান না চা?' (অতনু এক ফাঁকে ওর দাদার কথা পাড়বেই।)

'দাদা? চা খাবেন!' বুলু এমনভাবে চুপ করলো যেন এর চেয়ে আজগুবি, অসম্ভব আর-কিছু হ'তে পারে না।

'চা না-খেয়ে তোমার কষ্ট হয় না?'

'প্রথমে হ'তো। তারপর এখন না-খাওয়াই অভ্যেস হ'য়ে গেছে।'

'তুমি আজ বিকেলে আমার সঙ্গে এসে চা খেয়ো।'

'একদিন খেয়ে আর লাভ কী?'

'তবে রোজই খেয়ো।'

'তা নয়। আমি বলছিলাম, অভ্যেস যখন গেছে, তখন আর দু' একদিনের জন্য খেয়ে কী হবে।'

'দু' একদিন কেন? বললাম যে, রোজই খেয়ো।'

'রোজ? রোজ হ'লেই বা ক'দিন আর?' কথাটা ব'লে ফেলেই বুলু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লো।

অতনু ওর অপ্রতিভতা লক্ষ্য না-করবার ভাণ ক'রে বললে, 'যে-ক'দিন হয়। আজ বিকেলে আসবে?'

বুলু নীরব।

'কেউ বকবে তোমাকে এলে ?'

'বকবে কেন ? কক্ষনো নয়।' বুলুর প্রতিবাদের তীব্রতাই ওকে ধরিয়ে দিলে। যেন ওর কথা অকপটে বিশ্বাস ক'রে নিয়েছে, এই ভাবে অতনু বললে, 'তাহ'লে আসবে না কেন ?'

বুলু একটু চুপ থেকে বললে 'আচ্ছা, আসবো।'

এলোও। এসে নিজেই তৈরি করলে চা। অতনুর টী-সেট-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো ; অতনু চায়ে মাত্র এক চামচে চিনি খায় দেখে বিষম বিস্ময় প্রকাশ করলো ; কিন্তু টেবিলে ও বসবে না কিছুতেই। না বসুক—অতনু জোর করলো না।

অতনু বললে, 'রোজ এসো। আসবে ?'

বুলু তখন রাজি হ'লো বটে, কিন্তু পরদিন চায়ের সময়ে আর এলো না। এলো যখন, তখন প্রায় সন্ধ্যা, অতনু বিমর্ষচিত্তে ভাবছে—এখন আর না-বেরুলে চলছে না।

অতনু জিগেস করলে, 'এই বুঝি তোমার কথা ?'

বুলু গড় গড় ক'রে বললে, 'অনেকদিন পর চা খেয়ে কাল আমার সারারাত ঘুম হয়নি। আর চা খাবো না।'

অতনু মনে-মনে বললে, 'বুলু কিছুতেই এমন চমৎকার

মিথ্যে কথা বলতে পারে না। জবাবটা ও নিশ্চয়ই তৈরি ক'রে এসেছিলো।'

একটু পরেই বুলু চ'লে গেলো। অতনু রাস্তায় বেরিয়ে ভাবলো, 'যা-ই বলো, মোটার চাপা পড়া ব্যাপারটা নেহাৎ মন্দ নয়।'

৮

এদিকে, সাবিত্রী বোস গা-হাত-পা ছেড়ে একেবারে চুপ ক'রে থাকবে, এমন মেয়েই সে নয়। অতনুর বাংলা শব্দ-তত্ত্ব নিয়ে বই লেখার উপন্যাস তাকে মুহূর্তের জন্যও ভোলাতে পারবে, এমন মেয়েই সে নয়। অতনুকে সাবিত্রী চেনে; সাবিত্রী জানে, অতনুকে সর্বদা প্রাণ-পণে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে হয়, নইলে ফশ ক'রে কখন ফশকে যায়, ঠিক নেই।

একদা এই সাবিত্রী বোস প্রাগৈতিহাসিক বিশাল অরণ্যের সংকীর্ণ পথে তার পুরুষকে পরস্ত্রীর সঙ্গে পদ-চারণা করতে দেখে নিঃশব্দে তার গুহা-গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণ নখাঘাতে তার শত্রুর হত্যা-সাধন করেছিলো। কিন্তু এখন আর তার সে-দিন নেই। এখন তার মুখে কথা ফুটেছে। এখন সে ইংরেজি বলে, ফারশি কবিতা

আওড়ায়। এখন সে—শুধু যে নখ কাটে তা নয়, নখ কাটার পিছনে বিস্তর সময় ও অর্থ ব্যয় করে। এখন মনের ভাব গোপন করবার কৌশল সে শিখেছে। এখন আর ঈর্ষার প্রথম উদ্রেকের সঙ্গে-সঙ্গেই সে মারতে ছোটে না। এখন তার সবুর সয়। একদিন, হু'দিন, তিন দিন, এক সপ্তাহ পর্যন্ত সবুর সয়।

কিন্তু অষ্টম দিনেও যখন অতনু আবির্ভূত হ'লো না, তখন সাবিত্রী বোস ধৈর্য হারালো। হয়তো একবার তার মনে হ'লো—'থাক গে, আমার কী গরজ —!' কিন্তু আজকালকার সাবিত্রী বোস অভিমানের ধার ধারে না; অভিমান ভারি মেয়েলি! অতনুকে হাতে-পায়ে বেঁধে কেউ হিড় হিড় ক'রে তার কাছে টেনে নিয়ে আসে, তাহ'লে সে আনন্দে চীৎকার ক'রে ওঠে; জুতোর চোখা মুখটা দিয়ে অতনুর চোখা নাকটাকে ঠুকে দেয়; কিন্তু অভিমান—চ্ছোঃ!

তাই সে টেলিফোন তুলে···

এটা হচ্ছে বুলুর চা-খাওয়ার হু'দিন পরের কথা। সময়, সন্ধ্যা—যখন অতনু নিতান্তই মুখ-রক্ষে করবার জন্যে গোলদিঘির ধারে একটু হেঁটে বেড়ায়। বুলু অতনুর মা-র সঙ্গে ব'সে গল্প করছিলো, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

অতনুর অনুপস্থিতিতে টেলিফোন ধরবার হুকুম ছিলো চাকরের উপর। কিন্তু চাকরটা তখন গেছে বেরিয়ে ; তাই অতনুর মা বললেন, 'দেখে আয় তো, বুলু, কে ডাকছে। ব'লে দিস, অতনু বাড়ি নেই। ওকে কিছু বলতে হবে কিনা, জিগেস করিস।'

টেলিফোনে কথা ব'লা বুলুর অভ্যেস নেই ; একটু ভয়ে ভয়ে সে যন্ত্রটা তুলে খুব আস্তে বললে, 'হ্যালো ?' তক্ষুনি জবাব শুনলো, 'কে, অতনু ?' গলাটা মেয়েলি।

এবার পরিষ্কার গলায় বুলু বললে, 'না।' তারের অন্যপ্রান্তে সাবিত্রী চমকে উঠলো। গলাটা মেয়েলি।

'অতনুবাবুকে আমার দরকার। তাঁকে একটু ডেকে দেবেন দয়া ক'রে ?'

'তিনি বাড়ি নেই।'

'কোথায় গেছেন।'

'তা তো বলতে পারবো না।'

'কখন ফিরবেন ?'

'একটু পরেই।'

'একটু পরেই ? ঠিক জানেন ?'

বুলু ঠিকই জানতো, কিন্তু চট ক'রে নিজের অজান্তেই সে সাবধান হ'য়ে পড়লো।

—'না, ঠিক জানি না।'

'আপনি কি অতনুবাবুর মা ?'

'না।'

'তাঁর কোনো আত্মীয় ?'

'না।' বুলুর গলা মিইয়ে এলো।

'তা-ও নয় ? আপনি তবে কে ?'

বুলুর ইচ্ছে হ'লো, টেলিফোন ছেড়ে-ছুড়ে পালায়। দিশেহারা হয়ে ব'লে ফেললো, 'আমি কেউ নই।'

বুলু এবার রুপোর ঘণ্টার মতো অল্প একটু হাসি শুনতে পেলো।

'That's funny.. That's almost the funniest thing I've ever been told. Do you mind if I repeat the question ?'

বুলু অথই জলে প'ড়ে হাঁপাতে লাগলো।

একটু পরে ঃ 'ও, আপনি ইংরিজি বোঝেন না বুঝি ?' আবার একটু হাসি ধারালো তলোয়ারের ডগার মতো বুলুকে কেটে দিয়ে গেলো। বুলু কথা বলবে কী, তার সমস্ত মুখ এমন ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো যে নিশ্বাস ফেলাও তার পক্ষে কঠিন হ'য়ে উঠলো।

আবার প্রশ্ন হ'লো, 'কে আপনি ?'

বুলু যদি এখন শুধু ব'লে দেয় যে সে আর অতনু এক বাড়িতে থাকে না, তাহ'লেই গোল অনেকটা চুকে যায়,

কিন্তু প্রতিহিংসা নেবার এমন একটা সুযোগ সে-ই বা ছাড়বে কেন? প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে সে বললে:

'আমি কে, তা আপনার না-জানলেও চলবে।'

তারের ওপারে সাবিত্রী ঠোঁট কামড়ালো।

বুলু কর্ত্তব্য-সমাপন করলো, 'অতনুবাবু এলে তাঁকে কিছু বলতে হবে?'

'বলবেন যে সাবিত্রী বোস তাঁকে ডেকেছিলো। সা-বি-ত্রী—মনে থাকবে নামটা? আর-কিছু বলতে হবে না।'

টেলিফোন রেখে দিয়ে সাবিত্রী দাঁতে-দাঁত চেপে বললে, 'So!'

একটু পরে আবার বললে, 'And with a girl who doesn't understand a word of English! what low taste!'

একবার সাবিত্রী ভাবলো, অতনুকে আবার ডেকে—কিন্তু না, not yet। আর, মুখোমুখি কথা না-বললে কোনো কাজ হবে না। কিন্তু অতনু—what a doddering ass he's making of himself! মুচকি হাসলো সাবিত্রী। লোকে শুনলেই বা ভাববে কী? এ-সংকট থেকে অতনুকে উদ্ধার করতে হবে—অতনুরই ভালোর জন্য। সাবিত্রীই উদ্ধার করবে।

যেন এই উদ্ধার-কার্যে হাত দিতে সাবিত্রীর নিজের কোনোই গরজ নেই, এবং এ-ঝঞ্ঝাট তা'র ঘাড়ে না-জুটলেই সে বেঁচে যেতো, এই ভাবে গভীর আলস্যে সে সোফার উপর গা এলিয়ে দিয়ে একখানা বই খুললো। একটু পরেই তার হাত থেকে বইখানা খ'সে পড়লো। সাবিত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে। আজকালকার সাবিত্রীর সবুর সয়।—

অতনুর মা-র প্রশ্নের উত্তরে বুলু ঢোঁক গিলে বললে, 'কে একজন বন্ধু—নাম-টাম তো বললে না।'

'কিছু বলতে বললো?'

'না।'

বুলুর বুকের উপর গন্ধমাদন পর্বত চেপে বসেছে।

এ-সব কথা হচ্ছিলো বুলুর মা-র ঘরে ব'সে, তাই অতনু একটু পরেই যখন বাড়ি ফিরে এলো, কাউকে দেখতে না-পেয়ে বেশ-পরিবর্ত্তন করবার জন্য শোবার ঘরে চ'লে গেলো। চুল আঁচড়াচ্ছে, এমন সময় আয়নায় বুলুর ছায়া পড়তে সে ফিরে তাকালো। বুলুর মুখ কাগজের মতো শাদা, তার নিচের ঠোঁট অল্প কাঁপছে।

'আপনি এসেছেন!' বলতে বুলুর গলা কেঁপে গেলো।

অতনু শঙ্কিত হ'য়ে বললে, 'কী বুলু, কী হয়েছে?'

বুলু বললে, 'এইমাত্র সাবিত্রী বোস টেলিফোনে ডেকেছিলেন। সা-বি-ত্রী। নামটা ঠিক মনে আছে তো ?'

অতনু বুঝতে পারলো, বুলু অনেক কষ্টে কান্না চেপে আছে। ওর মন হালকা করবার জন্য সে চেষ্টা ক'রে মুখে হাসি এনে খুবই সহজ সুরে বললে, 'ও, সাবিত্রী। তা আর-কিছু বললে ?'

'বললেন—আর-কিছু বলতে হবে না।' বুলুর দু'চোখ ভ'রে এবার জল এলো।

অতনু জীবনে অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনো মেয়ের চোখে জল দেখিনি। কবিতার বাইরেও যে অশ্রু ঝরে, এটাও এতকাল তার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত ছিলো। তাই, সে কী করবে, কী বলবে, কিছুই দিশে ক'রে উঠতে পারলো না। তাই, এ-অবস্থায় যে-কথা তার কক্ষনো বলা উচিত ছিলো না, সে ঠিক সেই কথাই ব'লে ফেললো—'বুলু, তুমি কাঁদছো !'

ব'লেই বুলুর হাত ধরতে গেলো, কিন্তু কোথায় বুলু ? দরজার বাইরে অতনু মুহূর্তের জন্য তার শাড়ির কালো পাড় দেখতে পেলো। অতনু চেঁচিয়ে ডাকলো 'বুলু !'

ভাববার সময় অতনুর নেই। এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে সে ধাঁ-ধাঁ ক'রে বুলুর পিছন-পিছন নামতে লাগলো। সিঁড়ির গোড়ায় এসে যখন দাঁড়ালো, তখন

তার মুখ গরম হ'য়ে গেছে, জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়ছে। বুলু গেছে অদৃশ্য হ'য়ে, আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অমূল্য।

অমূল্য অমায়িকভাবে হেসে বললে, 'কী খবর, অতনুবাবু? এত তাড়া কিসের?'

অতনু (হায় অতনু!) কপালের ঘাম মুছে বললে, 'ভারি গরম।'

'সে-কথা আর বলবেন না, মশাই;—গরমে আলু-সেদ্ধ হ'য়ে গেলাম। দেখছেন এবারকার মনসুনের কাণ্ডটা! যেন বৃষ্টির জল পুঁজি ক'রে ও লাট হবে—একটু-আধটু ক'রে খরচ করছে। বেলজিয়মে, জানেন, এক বৈজ্ঞানিক বৃষ্টি তৈরি করেছেন। Manufatcured rains! ভাবতে পারেন! আশ্চর্য শক্তি, মশাই, বিজ্ঞানের।'

অতনু ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে বললে, 'আশ্চর্য।'

অমূল্য প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলো, 'শিক্ষা, অতনুবাবু, শিক্ষা! যে-দেশের শিক্ষা নেই, তার কখনো কিছু হবে না, এ আমি আপনাকে এক কলমে লিখে দি[illegible] পারি। আমাদের দেশের নেতারা কবে যে এটা বুঝবেন, তা-ই ভাবি। এই ধরুন, আমরা যে মেয়েদের লেখা-পড়া শেখাচ্ছি না, এতে কি দেশের মঙ্গল হচ্ছে? আমি বলবো,

কক্ষনো নয়। আমি, মশাই, ফীমেল-এডুকেশনের ঘোর পক্ষপাতী। ইস্কুলের ডিবেটিং ক্লাবে এ নিয়ে এমন-সব বক্তৃতা দিতাম যে—বুঝলেন, মশাই—হেডমাষ্টার থেকে শুরু ক'রে দরোয়ান পর্যন্ত সব থ খেয়ে যেতো। তবে বলতে পারেন, আমার মতামত যদি এতই অপ্-টু-ডেট্, ছোটো বোনটাকে কেন ইশকুলে পড়াচ্ছি না? আহা—আপনি না বলতে পারেন, আপনি সব দিক বোঝেন-সোঝেন,—কিন্তু বাইরের দশজন বলতে ছাড়বে কেন?—"কই, মুখে যে লম্বা-লম্বা বক্তৃতা করো, ইদিকে নিজের বোনেরই তো শিক্ষার ব্যবস্থা করছো না!" একেবারে যে করিনি, তা নয়। ইশকুলে ওকে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি ঘরের লোকের মতোই, আপনার কাছে বলতে বাধা নেই—মা মারা গেলেন, সংসার চালায় কে? তাই ছাড়িয়ে আনতে হ'লো। তবে বলতে পারেন—আহা, আপনি না-হয় বলবেন না, কিন্তু বাইরের লোকে বলতে ছাড়বে কেন?—বলতে পারেন, মাষ্টার রেখে দিয়ে ঘরেও তো পড়ানো যায়! যায় বইকি! আলবৎ যায়। আর, মাষ্টার যে একেবারে না রেখেছিলাম, তা নয়। তা-ও রেখে দেখেছি। কিন্তু এমন বিশ্রী কাণ্ড হ'লো, মশাই, তা বলবার নয়।'

'মাষ্টারটা গোমূর্খ ছিলো বুঝি?'

'শুনুন তাহ'লে। আপনি ঘরের লোকের মতো. আপনাকে বলতে বাধা নেই। মাষ্টার তো রাখলাম—এম.-এ. পাশ এক ছোকরা; সপ্তাহে চারদিন—কুড়ি টাকা। প্রথম সপ্তাহ যেতেই মাষ্টার রোববার ছাড়া রোজ আসতে আরম্ভ করলো। বললে—"অনেক শেখাতে হবে, চারদিনে কুলোবে না।" আমি বললাম, "বিলক্ষণ! তবে টাকা কিন্তু কুড়িতেই কুলোনো চাই।" মাষ্টার সাধুতার অবতার সেজে বললে, "ও-কথা তুলে আর আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন?" তখনই আমার সন্দেহ হ'লো। পরের দিন যখন মাষ্টার এলো, আমি দরজার বাইরে লুকিয়ে রইলাম। খানিক পরে উঁকি মেরে দেখি, বুলুর হাত থেকে একটা বই নিতে গিয়ে মাষ্টার বইটা না-নিয়ে ধরেছে হাতটা। বুলু অবশ্যি হাত ছাড়িয়ে নিলে, কিন্তু রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্ব'লে গেলো। হুঁ-হুঁ, এই ব্যাপার! তক্ষুনি আমি ঘরে ঢুকে "You bloody swine" (চীৎকার ক'রে) 'ব'লে জামার আস্তিন গুটিয়ে (সত্যি-সত্যি গুটিয়ে) 'সোনাচ্চাঁদ মাষ্টারের গালে এমন এক চড় বসালাম' (সঙ্গে-সঙ্গে অমূল্য এক বিশাল চড়ের অভিনয় করলো; তার হাতের তেলো অতনুর গালের পাঁচ আঙুল দূরে এসে থামলো;—অতনু দু'পা পেছনে হ'টে গেলো) 'যে সে চেয়ারসুদ্ধ উল্‌টিয়ে মেঝেয় প'ড়ে

গেলো। কোন ধানে কত চাল, বাছাধনকে টের পাইয়ে দিলাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ।'

ব'লে অমূল্য অতনুর মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে অসম্ভব চীৎকার করে' হাসতে লাগলো। অতনু আরো দু'পা পেছনে হটলো।—

সে-রাতটা অতনুর নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখে কাটলো। একবার দেখলো, তা'র মা পাগল হ'য়ে তাকে কামড়াতে আসছেন; একবার দেখলো, এক গালের দাড়ি কামিয়ে সে চৌরঙ্গি দিয়ে হেঁটে চলেছে, আর প্রত্যেক দোকানের আয়নায় নিজের মুখ দেখছে; একবার দেখলো, একা এক সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে সে বৃষ্টিতে ভিজছে, আর কাঁচা চিংড়ি মাছ চিবিয়ে খাচ্ছে। এমনি আরো অনেক। ভোরের দিকে (যা আর কখনো হয়নি) তার ঘুম ভেঙে গেলো। তেষ্টায় তার গলা শুকিয়ে গেছে। বিছানা ছেড়ে উঠে এক গ্লাশ জল খেয়ে সে আবার শুলো। এইবার সত্যি-সত্যি ঘুমুলো।

ঘুম ভাঙ্গলো তার অনেক বেলায়। উঠেই প্রথম কথা মনে হ'লো, 'বুলুকে আর দেখবো না।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো, ন'টা বাজে। যতটা খুশি বাজুক, আজ তার বিছানা ছেড়ে ওঠবার কোনো তাড়া নেই। একটু পরে চাকর তার চা আর খবরের কাগজ নিয়ে এলো।

চায়ে এক চুমুক দিয়ে খবরের কাগজ খুলতে যাবে, এমন সময় তার আবার মনে পড়লো, 'বুলুকে আর দেখবো না।' কাগজটা রেখে দিয়ে পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে সে একটু একটু ক'রে চা খেতে লাগলো।

তার পেয়ালার আদ্ধেকও শেষ হয়নি, এমন সময় বাড়ির ফটকে একটি মস্ত ঝকঝকে গাড়ি এসে দাঁড়ালো, আর তা থেকে নামলো এক ঝকঝকে মেয়ে। সাবিত্রী বাড়ির ভিতর ঢুকতেই প্রথম যার দেখা পেলো, সে বুলু। অতনুর বাড়িতে যে অন্য ভাড়াটে আছে, এটা সাবিত্রীর জানার কথা নয়, আর একটু আগেই রান্নাঘরে নিযুক্ত ছিলো ব'লে তার হাতে, শাড়ির আঁচলে হলুদের দাগ লেগে ছিলো। তাই সাবিত্রী তাকে ঝি বা ঐ গোছের কিছু মনে ক'রে সংক্ষেপে জিগেস করলে, 'অতনুবাবু অ্যাট্‌ হোম্‌?'

বুলু নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়েই অদৃশ্য হ'লো।

নারী-কণ্ঠ শুনে কৌতূহলী হ'য়ে আর-সবাই এলেন—বুলুর দাদা, পিসিমা, বাবা। কিন্তু সাবিত্রী তাঁদের দিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র না-ক'রে গটগট করে উপরে উঠে গেলো।

বুলুর বাবা বললেন, 'মেয়েটি ভারি পাখোয়াজ তো! কে?'

পিসিমা সাবিত্রীকে দেখে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। কোনো কথাই বলতে পারলেন না।

অমূল্য বললে, 'বেশ বেশ। চিরকালই আমি ফীমেল-ইমান্‌সিপেশনের পক্ষপাতী।' ব'লে সে একটা খেলো নাচের সুর শিষ দিতে-দিতে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

অতনুর মা ছেলের টেবিলে ব'সে একখানা চিঠি লিখছিলেন; সাবিত্রীকে দেখে কলম রেখে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চেনবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। সাবিত্রী নিঃসংকোচে তাঁর কাছে এসে বললে, 'Hullo, mater! Oh, I'm sorry, what I mean is—মানে, আপনি অতনুর মা তো?'

'হ্যাঁ।' তারপর কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'তোমাকে আগে কখনো দেখেছি ব'লে তো মনে পড়ছে না, বাছা।'

'না, আমাকে দেখেননি, তবে আমার কথা ঢের শুনেছেন। আমি সাবিত্রী। সাবিত্রী বোস।' ব'লে সাবিত্রী অতনুর মা-র মুখে দপ করে পরিচয়ের আলো জ্ব'লে উঠতে দেখবার আশায় একটু অপেক্ষা করলো। কিন্তু তাঁর মুখ যে তিমিরে সেই তিমিরে। মনের সমস্ত অলি-গলি খুঁজেও তিনি সাবিত্রী বোসের নাম পেলেন না। আরো ভালো ক'রে তার মুখের দিকে তাকালেন।

সাবিত্রী মর্মাহত হ'য়ে বললে, 'অতনুর মুখে আমার

নাম কখনো শোনেন নি?' এই প্রশ্নের কী উত্তর দিলে নিষ্ঠুর হবে না, অতনুর মা তা ঠিক ক'রে উঠতে পারলেন না। তাঁর দ্বিধা দেখে সাবিত্রী বললে, 'অতনুকে একটু ডেকে দেবেন kindly?'

কিন্তু ডাকতে হ'লো না। সাবিত্রীর রুপোর ঘণ্টার মতো স্বর অতনুর কানে গেছে, আর যাওয়া মাত্র তার মন গেছে অতল পাতালে ডুবে, মুখ গেছে ম্লানিয়ে। এক চুমুকে পেয়ালা শেষ ক'রে সে বিছানা থেকে উঠলো। পোশাক বদলাবার সময় নেই; শোবার পোশাকের উপর ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে নিলে। তারপর সিগারেটের বদলে পাইপ্ ধরিয়ে—যা থাকে কপালে—সে তার অনিবার্য অদৃষ্টের মুখোমুখি গিয়ে দাড়ালো। তার চালচলনে কৃত্রিম প্রফুল্লতা।

সাবিত্রীর সঙ্গে কোনো কথা বলবার আগে অতনু মা-কে বললে, 'মা, তোমার স্নান করবার সময় হয়েছে।'

মা যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই ছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়ার ছেড়ে ওঠবার আগেই সাবিত্রী অতনুর দু'হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললে, 'অতনু!'

অতনু বললে, 'কী খবর?'

অতনুর মা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

একটু পরে অতনু আবার বললে, 'তারপর কী খবর?'

মুহূর্তের জন্য হিংস্র প্রতিকূলতায় দু'জনের চোখোচোখি হ'লো। মুহূর্তের জন্য অতনুর ইচ্ছা হ'লো, সাবিত্রীর গালে ঠাশ ক'রে এক চড় বসিয়ে দেয় ; মুহূর্তের জন্য সাবিত্রীর ইচ্ছা হ'লো, অতনুর ঘাড়ের ওপর ঘ্যাঁক ক'রে বসিয়ে দেয় এক কামড়। এই সাংঘাতিক মুহূর্ত তারা দু'জনেই নিরাপদে উৎরোলো—ধন্যবাদ আমাদের সভ্যতাকে।

পরের মুহূর্তে অতনু একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে ফের পাইপ ধরালো, আর সাবিত্রী হঠাৎ তার মধুরতম নারীত্বে গ'লে গেলো। অতনুর পিছনে দাঁড়িয়ে তার চুলগুলি হাতে মুঠোয় নিয়ে বললে, 'অতনু, তুমি আমার উপর রাগ করেছো ?'

অতনু কাষ্ঠ-কণ্ঠে বললে, 'না।'

সাবিত্রী তার আঙুল দিয়ে অতনুর চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে, 'ডার্লিঙ, তুমি মুখে "না" বলছো বটে, কিন্তু তুমি রাগ করেছো, করেছো, করেছো—এ আমি তোমার মুখ না-দেখেই বুঝতে পারছি। কেন রাগ করেছো ? কী করেছি আমি ?'

অতনু বললে, 'অসহ্য !' কথাটা সে এতক্ষণ মনে-মনে ভাবছিলো, বলার উদ্দেশ্য তার ছিলো না ; অতর্কিতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

নিমেষে সাবিত্রীর শরীরের ও স্বরের সব তরল উষ্ণতা জ'মে বরফের মতো ঠাণ্ডা ও শক্ত হ'য়ে উঠলো। অতনুর চুল ছেড়ে দিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বললে, 'অতনু, you are an ass !'

অতনু বিনীতভাবে বললে, 'হ্যাঁ, আমি তা-ই। তার চেয়েও খারাপ। নইলে তোমাকে বাড়ি থেকে বা'র ক'রে দিতাম।'

সাবিত্রীর গালের রাসায়নিক রক্তিমার উপর দিয়েও ফুটে উঠলো অপমানের লাল রং।

কিন্তু সে হিস্টিরিয়ার ধার ধারে না—ওটা ভারি মেয়েলি। আশ্চর্য তার সংযম—ধীরে-ধীরে হাত-ব্যাগ খুলে' সে মুখে এক পোঁচ পাউডর লাগালো। তারপর এতক্ষণে একটা মনের কথা বললে, 'অতনু, এখন আমি তোমাকে খুন করতে পারতাম।'

অতনু হেসে বললে, 'মেলোড্রামাটিক সিনেমা দেখার এ-ই ফল।'

সাবিত্রী হেসে বললে, 'আর সেন্টিমেণ্টল সিনেমা দেখার ফল কী? কাঁচা শৈশবকে sweet ..teen বলা, মূর্খতাকে পবিত্রতা ব'লে ভুল করা, বোকামিকে artlessness মনে ক'রে নিজের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়া —কী বলো?'

অতনু বললে, 'তুমি কিছুই জানো না, সাবিত্রী ; তুমি চুপ ক'রে থাকো।'

সাবিত্রী বললে, 'তোমার বই কদ্দুর লেখা হ'লো, অতনু ? বাংলা শব্দতত্ত্ব ?'

অতনু প্রাণপণে পাইপ টেনে রাশি-রাশি ধোঁয়া বা'র করতে লাগলো।

'ডি.-লিট. হলে খবর দিতে ভুলো না, অতনু। It would be such a pleasure to congratulate you.'

অতনু মধুরস্বরে বললে, 'এ-সব খেলো রসিকতা তোমাকে মানায় না, সাবিত্রী।'

সাবিত্রী মধুরতার মাত্রা আরো এক ডিগ্রি চড়িয়ে দিয়ে বললে, 'রসিকতা জিনিশটাই খেলো ; খেলো জিনিশকে একটু বেশি খেলো ক'রে দিলে এসে যায় না। কিন্তু ভালোবাসা জিনিশটা গভীর ; তাকে খেলো ক'রে দিলে পৃথিবীর লোকে হাসে—আর স্বর্গের দেবতারা কাঁদেন। তুমি যা করছো, অতনু, তা-ই কি তোমাকে মানায় ?...And with a girl who doesn't understand a word of English !'

অতনুর মুখ ব্যথায় নীল হ'য়ে গেলো। একটু পরে সে অর্ধোচ্চারণ করলে, 'তুমি চুপ করো, সাবিত্রী !'

সাবিত্রী বুঝলে তার জয় আসন্ন। তাই সে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিলে, 'What *low* taste!'

অতনু প্রার্থনার মতো করে' ডাকলো, 'সাবিত্রী!'

সাবিত্রী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'তোমার latesকে একবার দেখবার ইচ্ছে ছিলো, অতনু। সে-সৌভাগ্য হবে কি?'

অতনু নীরব।

'ভয় নেই তোমার, আমি ছোটো মেয়েদের কাঁচা মাংস খাইনে। Really, কী ক'রে জোটালে বলো তো?'

অতনু ভাবলো, পালা তো ফুরুলোই, এখন যদি সে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আর একটি কথাও না বলে, তবু কিছু লাভ নেই। যা হয়েছে, তা হ'য়েই গেছে। তাই সে আরম্ভ করলে, 'বুলু—'

'বুলু? বেশ নাম! বেশ homely—না?'

'—নিচে যে-ভদ্রলোক থাকেন, বুলু তাঁর মেয়ে।'

সাবিত্রী চট ক'রে সব বুঝে নিলে।—'Oh, is it? is it? তা-ই বলো। And I took her for a servant!... Very sorry to have hurt your feelings, mon cher—কিন্তু—'বুলুর হলুদ-মাখা হাত আর আঁচল মনে ক'রে সাবিত্রী হেসে উঠলো।

'Tired হ'তে কত দেরি, অতনু?'

অতনু আকস্মিক উত্তেজনায় ব'লে' উঠলো 'I'm thoroughly, *thoroughly* tired of you. Please go away.'

এবার কিন্তু সাবিত্রী চটলো না। অতনু মুহূর্তের উত্তেজনা দেখিয়েই নিজের হার মেনে নিয়েছে। সাবিত্রী এখন নিশ্চিন্ত। কাল, না পরশু—এখন এ-ই শুধু প্রশ্ন। তাই সে তার মধুরতম হেসে বললে, 'যাচ্ছি। এক্ষুনি যাচ্ছি। কিন্তু আমাকে একটু এগিয়ে দেবে না, অতনু?'

অতনু ভাবলে, সমুদ্রে যার শয়ন, তার শিশিরে ভয় কিসের?' সাবিত্রীর সঙ্গে-সঙ্গে নিচে এলো সে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বুলুর বাবা ভাবলেন—ছেলেটা একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। শুধু অমূল্য নাচের সুর শিষ দিতে-দিতে বেরিয়ে এলো। বুলু রান্নাঘরে।

সাবিত্রী সবাইকে শুনিয়ে বললে, 'Good-bye, dearest, good-bye.'

অমূল্য একগাল হেসে জিগেস করলে, 'ইনি কে এসেছিলেন, অতনুবাবু? ভারি আপ্-টু-ডেট্ তো।'

'হ্যাঁ, খুব।' ব'লে অতনু উপর চ'লে গেলো।

রাত্তিরে অতনুর খাবার সময় মা বললেন, 'সবার চোখে তো আর সব ভালো দেখায় না, অতনু;—আজ সারাদিন ওদের মুখে এ ছাড়া কথা নেই। বুলুর পিসিমা তো

আমার মুখের উপরই বললেন, "ছেলেকে শুধু পাশ করালেই চলে না, দিদি। পাশ করলেই লোকে মানুষ হয় না।"'

অতনু বললে, 'হুঁ।'

'আমি আর কী বলবো, বলো? চুপ ক'রে কথা শুনতে হ'লো। তা বুলুকে ওরা আর এখানে কিছুতেই রাখবে না। কালই বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে, ওর বুড়ি ঠাকুরমার কাছে। ওর বাবা বলেছেন—যেমন ক'রেই হোক, আষাঢ় মাসের মধ্যেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন। বিয়ে দিলেই নিশ্চিন্তি!'

অতনু বললে 'হুঁ।'

'মেয়েটার উপর আমার মায়া পড়েছিলো, অতনু—ভারি কষ্ট হচ্ছে ওর জন্যে। বেচারার অপরাধের মধ্যে তো এ-ই যে ও মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে! অথচ, ওর মুখের দিকে তাকানো যায় না—আজ সারাদিন খালি কেঁদেছে। মা না থাকার এ-ই তো কষ্ট, অতনু, মেয়ের দুঃখ কি বাপ-দাদায় বোঝে? আজ ওর মা থাকলে কি ওকে জোর ক'রে এখান থেকে পাঠাতে পারতো? তোর অবিবেচনার জন্য ওর হ'লো শাস্তি। এ কথাটা ভেবে আমার আরো খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে, ওর মা-র কাছে যেন আমি জন্মের মত দোষী হ'য়ে রইলাম।'

অতনু বললে, 'ওদের কাল থেকে এক মাসের নোটিশ দিয়ে দাও। আর আমাদের ভাড়াটে রেখে কাজ নেই।'

•

পরদিন দুপুর। বুলু এক্ষুনি চ'লে যাবে। অমূল্য গাড়ি ডাকতে গেছে—সে-ই তাকে নিয়ে যাবে। বুলু সাজসজ্জা ক'রে প্রস্তুত। মনের দুঃখে অতনুর মা নিচে নামছেন না—বুলুর যাওয়া তিনি চোখে দেখ্‌তে পারবেন না। বুলুর পিসিমা বললেন, 'একবার দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে আয় গে, যা। কিন্তু—'

বুলু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

মাসিমার পদধূলি নিয়ে বুলু বেরিয়ে এলো। মাসিমা উদাসভাবে তাকে বলেছেন—'এসো গে।' আর দু'-একটা কথাও তো তিনি বলতে পারতেন! কিন্তু কান্নায় যে মাসিমার গলা আটকে গিয়েছিলো, তা তো বুলু জানে না।

বুলু সোজা নিচেই চ'লে যাচ্ছিলো, হঠাৎ অতনুর শোবার ঘরের দরজার পরদাটা তার চোখে পড়লো। সে তাকালো; কিছুই দেখা যায় না। একটু কাছে গেলো, দরজার কাছে গেলো। পরদাটা একটু তুলে সে কি একবার দেখতেও পারে না? আজই তো শেষ। তার চোখে যাকে এত সুন্দর লেগেছিলো—!

পরদাটার এক কোণ তুলে' সে দেখলো, অতনু খাটের উপর ঘুমুচ্ছে, আর তার পাশে একখানা পাতা-খোলা বই চিৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে। একবার যাওয়া যায় না? গিয়েই চ'লে আসবে, কাছে থেকে একবার দেখে। তার চোখে যাকে এত সুন্দর লেগেছিলো, তাকে একবার দেখবে শুধু। আজই তো শেষ।

বুলু খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই অনেক ফুলের গন্ধে অতনুর ঘুম হালকা হ'য়ে এলো। না—ফুলের গন্ধ তো নয়, মেয়েলি প্রসাধনের, প্রসাধনেরও নয়, এ যেন দেহেরই গন্ধ, দেহেরও নয়, মনের—নারী-সত্তার চিরন্তন সৌরভ যেন।

লালচে চোখ মেলে বুলুকে দেখে কিছুই বুঝতে পারলো না অতনু, নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো।

বুলু বললে, 'আমি যাই।'

যেন স্বপ্নের মধ্যে অতনু বুলুর একখানা হাত টেনে নিলে, সে-হাতটি চেপে ধরলো নিজের মুখের উপর, আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে-মনে বললো, 'বুলু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই [illegible]সি না।'

পাশ ফিরে অতনু আবার ঘুমিয়ে পড়লো।...

চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে অতনু আবিষ্কার করলো যে তার মনে খুশি আর ধরে না। কারণ অনুসন্ধান

করতে গিয়ে তার মনে পড়লো সে ভারি মধুর একটা স্বপ্ন দেখেছে আজ! কে একটি মেয়ে—বুলুইতো, হ্যাঁ, বুলু। বেচারাকে ওরা জোর ক'রে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে। যাবার সময় ও দেখা ক'রেও যেতে পারলো না। ভালোই হয়েছে—কান্নাকাটি করতো হয়তো।

আজ তার মন খুব ভালো—এই উপলক্ষ্যে সে আজ সাহেবি পোশাক পরবে, দিনটিকে একটুখানি বিশেষত্ব দেবার জন্যে। সযত্নে সে পরিপাটি বেশভূষা করলো ;—টাই আর মোজার রং ম্যাচ করাতে পনেরো মিনিট সময় কাটালো। তারপর চা খেয়ে, সিগারেট ধরিয়ে হেরিদিয়ার সনেট আবৃত্তি করতে-করতে রাস্তায় বেরুলো। শিষ দিতে পারলে শিষই দিতো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

সুনীল আর লুসি-ললিতা

অনেক দূর থেকে ভেসে এলো লুসি-ললিতার কণ্ঠস্বর ঃ 'তুমি?' সঙ্গে-সঙ্গে সুনীলের ঘুম ছুটে গেলো।

ছুটে গেলো, যদিও কাল রাত্তিরে—আজ সকালেই বলা যায়—শুতে-শুতে তার বেজে গিয়েছিল দুটো, আর ঘুমোতে-ঘুমোতে প্রায় তিনটে। কাল রাত্তিরে 'Studio'র নবাগত সংখ্যাটার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে হঠাৎ তার মাথায় নতুন একটা আইডিয়া দেখা দিলো। কাল-বৈশাখীর মেঘের মতো। প্রথমে এই এতটুকু, চোখে দেখা যায় কি না যায়, একটু পরেই প্রকাণ্ড, হিংস্র-দর্শন—দেখতে-না দেখতে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো, ছুটলো হাওয়া, জাগলো ঢেউ। সেই ছবির কল্পনায় সুনীল ডুবে গেলো, ওর মনে গেলো নেশা ধ'রে। প্রথমে শুধু কল্পনা—অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ ; ক্রমে ধোঁয়া কেটে গিয়ে পরিষ্কার রেখা ফুটে উঠ্‌লো—দৃঢ়, সবল সব রেখা। তারপর চড়লো রং—উজ্জ্বল, উদ্ধত লাল, লাল আর সোনালি। আগুনের লাল, সিঁদুরের লাল, জবাফুলের লাল, সূর্যাস্তের অগণ্য লাল। ছবি হ'য়ে গেছে—সুনীল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ; ছবিটা ওর চোখের সামনে ঝুলতে

থাকলেও এর চেয়ে স্পষ্ট ক'রে ও দেখতে পেতো না। চোখ বুজলে ছাখে, চোখ মেললে ছাখে। সত্যি বলতে কী, সেই ছবি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না।

আর্টের ভাষায় একে বলে ইন্সপিরেশন, আর সাধারণ ভাষায় মাথা-গরম-হওয়া। অন্তত, যে-যে কারণে মানুষের মাথা গরম হয়, তার মধ্যে এই ইন্সপিরেশন একটি—এবং খুব ফ্যালনাও নয়। বরং, একটা বড়ো রকমের কারণ ব'লেই ধরা যেতে পারে। সুনীলকে দিয়েই দেখুন না; ওকে যেন ভূতে পেয়েছে—পঁচিশে ডিসেম্বরের রাত্রেও ওকে ছাতে পাইচারি করতে হচ্ছে—ছবিটা এঁকে না-ফেলা পর্যন্ত ওর ঘাড়ে চেপে থাকবে; কিছুতেই নামবে না, কিছুতেই শান্তি দেবে না। ছবি একেবারে তৈরি—কোথাও কোনো ফাঁক নেই; এখন আঁকলেই হ'লো। কিন্তু আঁকা নিয়েই তো মুশকিল। মুহূর্তের মধ্যে যে প্রাণ-বীজ নারীগর্ভে সঞ্চারিত হয়, পূর্ণাবয়ব, জীবন্ত মানুষ হ'য়ে বেরিয়ে আসতে তার লাগে ন' মাস—তা-ও কত যন্ত্রণার পরে। ভাবতে যা এক ঘণ্টাও নিলো না (কল্পনা করতে মুহূর্তও নয়), তা-ই রেখায়-রঙে সম্পূর্ণ, জীবন্ত ক'রে তুলতে নেবে এক মাস—কে জানে, হয়তো আরো বেশি। আর তা-ও কত কষ্ট, কত পরিশ্রমের পর। কত চোখ-টাটানো, মাথা-ধরা, টিনে-টিনে সিগারেট, চায়ের

পেয়ালার পর পেয়ালা। তবে তার ছবি পৃথিবীর লোক দেখ্‌তে পাবে—তা-ও, সে এখন যে-ছবি দেখ্‌ছে, ঠিক তা-ই দেখবে না. তারই এক নিকৃষ্ট সংস্করণ দেখবে। মনে-মনে যা ভাবা যায়, কাজেও ঠিক তা-ই করা কি সম্ভব ? সম্ভব নয়, তবু সুনীলের সবুর সইছে না ; সম্ভব নয় ব'লেই সইছে না। যত দেরি করবে, কল্পনা জুড়িয়ে যেতে থাকবে, বেশি দেরি করলে হারিয়েও যেতে পারে। সুনীলের এমন অনেক আইডিয়া হারিয়ে গেছে। রাত্তিরে কেন ছবি আঁকা যায় না ? ইশ—কাল অবধি তাকে অপেক্ষা করতে হবে, এই বিষম বোঝা বইতে হবে ! এতগুলো ঘণ্টা সে কাটাবে কী ক'রে ? কেন ? ঘুমিয়ে। ঘুমোলে পাঁচ ঘণ্টা চক্ষের পলকে কেটে যাবে। কিন্তু ঘুম কি আসবে ? আসবে বইকি, চুপচাপ খানিক শুয়ে থাকলে নিশ্চয়ই আসবে। বরফের মতো ঠাণ্ডা জল দিয়ে মাথা ধুয়ে শুয়ে পড়লো সে। অন্ধকারে তার ছবির লাল আর সোনালি জ্বলজ্বল করছে। সে চোখ বুজলো, পাশ ফিরলো, উবু হয়ে শুলো। অন্ধকারের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, আবার চোখ বুজলো। এমনি…রাত প্রায় তিনটে অবধি।

পুরো সাড়ে তিন ঘণ্টার ঘুমও সুনীলের হয়নি। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে টেলিফোনের তীক্ষ্ণ ঘণ্টা ওর ঘুমকে

গুলিয়ে দিয়ে গেলো। ভোরবেলাকার হালকা ঘুমের মতো বিলাসিতা মানুষের জীবনে কমই আছে ; তাতে একবার বাধা পড়লে সারাটা দিনই খারাপ কাটে। তাছাড়া, এ-ক্ষেত্রে সুনীলের পক্ষে এটা বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন ; (যদিও বিলাসিতা যে কেন প্রয়োজন নয়, তা আমি আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি)—গুরুতর প্রয়োজন, লোকে বলবে। তাই পাশ ফিরে সে ঘুমের ছেদটা জোড়া দিতে চেষ্টা করলো ; কে না কে ডাকছে, —ব'য়ে গেছে ওর গরম লেপের তলা থেকে উঠে গিয়ে হেঁলো-হেলো করতে !...কিন্তু টেলিফোনের বিরাম নেই ; খানিক পর-পর বেজেই চলেছে। নাঃ, জ্বালিয়ে মারলে ! শেষ পর্যন্ত উঠে গিয়ে হয়তো দেখবে, ভুল নম্বর।...আঃ, আবার ! লেপের তলাটায় ভারি আরাম লাগছে, ওর ছুই চোখে ঘুম রয়েছে জড়িয়ে। নাঃ, ঐ অভব্য যন্ত্রটার মুখ বন্ধ না-করলে আর শান্তি নেই !

ঘুমে ঢুলতে-ঢুলতে ও শীতে কাঁপতে-কাঁপতে সে টেলিফোন তুললো। কী ঠাণ্ডা ! আর তার বিছানা কী গরম—আর নরম আর আরামের। রুক্ষ ইংরিজিতে সে জিগেস করলো : 'হূজ দ্যাট্ ?'

অনেকদূর থেকে ভেসে এলো লুসি-ললিতার কণ্ঠস্বর : 'তুমি ?'

সঙ্গে-সঙ্গে সুনীলের ঘুম ছুটে গেলো। হঠাৎ তার গলার আওয়াজ পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। এমনকি, কোমল।—'লুসি-ললিতা ?'

প্রশ্নটা অবিশ্যি বাহুল্য। শুধু ঐ নাম উচ্চারণ করবার জন্যেই করেছে। চমৎকার নাম, লুসি-ললিতা। লিখতে ভালো—যেমন : লুসি-ললিতা, লুসি-ললিতা। আবার : লুসি-ললিতা। বলতে ভালো (মনে-মনে সুনীল উচ্চারণ করলে) : লুসি-ললিতা, লুসি-ললিতা, লুসি-ললিতা। চমৎকার নাম। চমৎকার মেয়ে। দুই চোখ ওর উৎসবের প্রদীপের মতো উজ্জ্বল ; পাৎলা শরীরে ওর বতিচেলির নরম সব রেখা, ঢেউয়ের মতো তরল সব রেখা। বতিচেলির ভিনাসের মতো ঘন কালো চুল—এলো চুল ; প্রায়ই এলো। গেলো সাত বছরের মধ্যে সুনীল একটি দিনের কথাও মনে করতে পারে না, যেদিন ও ওর খোঁপা-বাঁধা চুল দেখেছে। লুসি-ললিতাকে মনে করতেই সারা পিঠে ছড়ানো মন কালো চুল মনে পড়ে। নরম চুল, সুগন্ধি চুল। একদিন সুনীল বলেছিলো, 'তোমার চুল যেন রাত্রি, আর তোমার সিঁথি যেন ভোরের প্রথম আলো।' লুসি-ললিতা আস্তে বলেছিলো, 'কী যে বলো!' এত আস্তে বলেছিলো যে সেটা অনুযোগ না অনুমোদন বোঝা যায়নি। লুসি-ললিতা সব কথাই আস্তে বলে ; এমন

মৃদু, এমন নরম ক'রে বলে যে ওর মুখে সব কথাই মনে হয় গোপন কথা, অতি সাধারণ কথাও প্রেমের কথা। আর, কথা বলার সময় এমন গভীর চোখে তাকার, একটু মুখ তুলে, সমস্ত চোখ ভ'রে এমন ক'রে তাকায় যে আপনার মনে হবে (যদি না ওর সঙ্গে আপনার অনেক দিনকার আলাপ হয়) ও আপনার প্রেমে পড়েছে। ওর যা স্বভাব, তাকে অনেক ছেলে ভুল বুঝে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছে ; পরে সে-ভুল যখন ভেঙে গেছে, আরো বড়ো ভুল ক'রে ওকে কোকেট মনে করেছে। লুসি-ললিতা কোকেট নয়, কারণ ও আধুনিক নয় ; লুসি-ললিতা সেকেলে ; সংস্কৃত নায়িকাদের মতো ও হৃদয়াবেগের মর্যাদা বোঝে, টুর্গেনিভের নায়িকাদের মতো ও প্রেমের সম্মান করতে জানে। এ-ই লুসি-ললিতা।

এই লুসি-ললিতাকে আমি দু'একবারের বেশি দেখি নি। বাইরে ও বেশি বেরোয় না। যেখানে সবাই আসে, অমিতা চন্দ আর সাবিত্রী বোস আর শর্বরী রায়, যেখানে আসে এরা আর ওরা, এবং আরো অনেকে— সেখানেও লুসি-ললিতাকে সচরাচর দেখা যায় না। আধুনিকতা ওর সয় না ; অনেক লোকের মধ্যে ওর মন ওঠে হাঁপিয়ে। ও ভালোবাসে একা থাকতে, নিজের কাজ নিয়ে, সন্ধ্যায় একজন বন্ধু, রেড রোড ধ'রে অনেক-

দূর হেঁটে-আসা ; তারপর গঙ্গার ধারে বসে' চা। অমিতা চন্দ আমাকে বলেছে, ও নাকি ছবিও আঁকে—ইণ্ডিয়ান আর্টের ঢঙে। ইণ্ডিয়ান আর্টের মর্ম আমি বুঝি না ; চক্ষুকে পীড়া দিলেই আত্মা পরমানন্দ লাভ করে কিনা, তা, আমার জানা নেই ; কাজেই লুসি-ললিতার শিল্পচর্চা সম্বন্ধে কোনো-কালেও কিছুমাত্র উৎসাহ দেখাইনি।

লুসি-ললিতার সম্বন্ধে এইটুকুই জানতাম ; আর জানতাম, ও সুনীলের দিন আর রাতকে মধুর ক'রে রেখেছে। তাই সুনীল মুখে অতনুর প্রণয়-সৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষার ভাণ করলেও, মনে-মনে ওকে ঈর্ষা করে, এমন লোকও ছিলো। যেমন আমি। আমাদের সবাইকে একটা বিশ্রী ছটফটানি তাড়া ক'রে বেড়ায়—নিজেকে গুছিয়ে নিতে দেয় না, স্তব্ধ জল্পনার অবসর দেয় না, ঠেলে নিয়ে চলে এক উত্তেজনা থেকে অন্য উত্তেজনায়। শুধু সুনীলকে দেখে মনে হ'তো, তরঙ্গোচ্ছ্বাসের স্তর পেরিয়ে ও পেয়েছে গভীরতার আশ্রয় ; সেখানকার নীরবতা শব্দের অভাব নয়, শব্দের সমাধি। ওর মধ্যে আর চাঞ্চল্য নেই, নিজেকে ও খুঁজে' পেয়েছে। জানতাম, এর মূলে রয়েছে লুসি-ললিতা। জানতাম, লুসি-ললিতা সুনীলের দিন আর রাত মধুর ক'রে রেখেছে—দিনের স্বপ্ন আর রাতের স্বপ্ন। অতনুর মতো যারা রমণীমোহন, তাদের

সত্যি-সত্যি করুণা করবার অধিকার ওর আছে। অতনুর সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে যে মেয়েদের সঙ্গ ও উপভোগ করে না, সহ্য করে। অতনু বলবে (অন্তত, ওর বলা উচিত) যে কথাটা সত্যি নয়। এক হিশেবে, সত্যি নয়ও। মেয়েদের উপভোগ ও করে বইকি—কিন্তু সে কী রকম, জানেন ? যেমন উপভোগ করে সকালে ঘুম থেকে উঠে চা। ওটা ওর একটা অভ্যেস, আর অভ্যাসে শুধু আরাম আছে,আনন্দ নেই। ভালো লাগাকে অভ্যাসে বাঁধবার পক্ষপাতী নয় সুনীল। আজকালকার দিনে রুটিন-বাঁধা কাজ তো আমাদের করতে হচ্ছেই, তা এড়াবার উপায় নেই। কিন্তু কাজের সময়ের পর যখন আসে অবসর, কাজের জগৎ ছেড়ে যখন বেরিয়ে এলাম উপভোগের জগতে, তখন অন্তত আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাক, সেখানকার হাওয়ায় অন্তত নিয়মের বিষ যেন ছড়ানো না হয়। নিয়ম ক'রে লেখাপড়া যদি হয় তো হোক, কিন্তু দোহাই দেবতার, নিয়ম ক'রে খেলার ব্যবস্থা যেন না হয়। খেলা কথাটাই চূড়ান্ত অনিময় সূচনা করছে। এই অনিয়মের হাওয়ায় পাল তুলেছে সুনীলের রং-বিলাসী মন, তাই লুসি-ললিতার কাছে খুব ঘন-ঘন সে যায় না। রোজ যাওয়া তো যাওয়া নয়, হাজিরা দেয়া। ও ভালোবাসে নিজের কাজ নিয়ে ঘরে

ব'সে থাকতে। দিনের পর দিন যায় ; লুসি-ললিতা আছে, এ-কথা ভাবতেই ওর ভালো লাগে। লুসি-ললিতা আছে ; যে-কোনো সময়ে ও তার কাছে যেতে পারে, তাই যে-কোনো সময়ে যাবার দরকার নেই। যেদিন ইচ্ছে হবে, সত্যি ইচ্ছে হবে, সেদিন ও যাবে। লুসি-ললিতাকে দেখবে, শুনবে, অনুভব করবে। এই ইচ্ছেটা কখন কী ক'রে যে হয়, কেউ বলতে পারে না। চমৎকার এর অনিয়মতা ; কোনো সপ্তাহে তিনবার, আবার কখনো মাসে একবারও নয়। লুসি-ললিতার সঙ্গে ওর শেষ দেখা হয়েছিলো ন'দিন আগে। এ ক'দিন কিচ্ছু মনে হয়নি, কিন্তু কাল রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে ওর মনে হয়েছিলো—লুসি-ললিতাকে মনে পড়েছিলো। তাই বুঝি আজ ওর ঘুম না-ভাঙতেই লুসি-ললিতা ওকে ডাকছে। অদ্ভুত এ-তু'জনের মতের, এবং—যা বেশি অদ্ভুত—মনের মিল। ওরা একসঙ্গে একই কথা ব'লে উঠেছে, এমন তো প্রায়ই হয়েছে ; এখন এ কী বলবে, ও তা প্রায়ই আগে থেকেই বুঝতে পারে। আবার, বৈষম্য যে একেবারে নেই, তা-ও নয়। আছে, আর্ট নিয়ে, লুসি-ললিতার দেবতা বতিচেলি, সুনীলের মাইকেলেঞ্জেলো, রাফাএল। ফলে, তর্ক হ'তো। এমন তর্ক, যার হার-জিৎ নির্ধারণ করা অসম্ভব। তর্কের মাঝখানে হঠাৎ

দু'জনে একসঙ্গে চুপ ক'রে যেতো। সুনীল চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবতো : 'আসলে আমরা দু'জন এক—একই জিনিশের দুই অর্ধেক। দু'জনে মিলে আমরা একজন।' তারপর তর্ক যেতো ভেসে। সুনীল জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে—যেন নিজের মনেমনে—ডাকতো : 'লুসি-ললিতা, লুসি-ললিতা, লুসি-ললিতা।' যেমন ও এইমাত্র ডাকলো, টেলিফোন থেকে মুখ সরিয়ে।

'ঘুম ভেঙেছে তোমার?...ভেঙেছে নিশ্চয়ই, নইলে আর কথা বলছো কী ক'রে? আমিই তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম বুঝি?'

'হ্যাঁ।' ('আজ সকালে তুমি আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেবে, লুসি-ললিতা, তাই কাল রাতে—অনেক রাতে—অনেক ছটফটানির পর চোখে যখন ঘুম এলো, তখন মনে পড়লো তোমার কথা। লুসি-ললিতা, তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে, কেন কাল আমার অনেক রাত অবধি ঘুম আসেনি। তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে, কেন অতৃপ্ত ঘুম নিয়ে উঠেও এখন আর আমার বিছানায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না; কেন, বিছানায় ফিরে গেলেও এখন আর আমি ঘুমোতে পারবো না।')

এম্‌নি ভেবে চলেছে সুনীলের মন; আর সঙ্গে-সঙ্গে তার কান শুনছে, আর বলছে কথা।

'শোনো : তুমি এক্ষুনি আমাদের এখানে চ'লে এসো। কেমন ?'

'কিন্তু আমি যে এখনো—'

'তোমাকে মুখ ধুতে হবে না ; চা খেতে হবে না ; বাক্স থেকে ইস্ত্রি-করা জামা বা'র করতে হবে না। "যেমন আছো তেমনি এসো"—এবং এক্ষুনি এসো।'

'কিন্তু কেন বলো তো ?' ('কেন আবার কী ? এ-কথা কেন জিগেস করতে গেলাম ?')

সুনীলের মনের কথা লুসি-ললিতার মুখে ধ্বনিত হ'লো :

'কেন আবার কী ?'—'এ-কথা কেন জিগেস করছো ? আজ ঘুম ভাঙামাত্র তোমার কথা মনে পড়লো আমার। তখনো বাইরে অন্ধকার, তখনো তোমাকে ডাকা যায় না। বাইরে কুয়াশা ; ঘরে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আস্তে-আস্তে কুয়াশা কেটে যেতে লাগলো ; তখনো তোমাকে ডাকা যায় না। এখন আকাশ রোদে হেসে উঠেছে, ঘড়িতে বেজেছে সাতটা—তাই তোমাকে ডাকছি। তুমি এসো। সাড়ে সাতটার মধ্যে তোমার আসা চাই— বুঝলে ?'...

সাড়ে সাতটার মধ্যে। বীডন স্ট্রীট থেকে লেক রোড। সুনীল ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিলে ট্যাক্সি আনতে—ট্যাক্সি আসতে-আসতে সে তৈরি হয়ে নেবে।

২

লুসি-ললিতা নিচের বারান্দাতেই অপেক্ষা করছিলো বোধ হয়; গাড়ির আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এলো। সুনীল গাড়ি থেকে নেমে হাতে-হাত ঘষতে-ঘষতে বললে: 'উঃ, কী ঠাণ্ডা!'

কেননা, তাড়াতাড়িতে গায়ে একটা র্যাপার জড়িয়ে নিতেও তার মনে ছিলো না। ভোরবেলার খালি রাস্তায় ট্যাক্সি ছুটেছিলো দারুণ বেগে; কনকনে হাওয়া। আসতে-আসতে সুনীল ভাবছিলো, লুসি-ললিতার 'এক্ষুনি'কে এতটা literally না-নিলেও বিশেষ ক্ষতি ছিলো না। লুসি-ললিতার গায়ের লাল শালটির দিকে সে ঈর্ষার দৃষ্টিতে একবার তাকালো।

কিন্তু একটু পরে পকেটে হাত দিয়ে সে যা আবিষ্কার করলো, তাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা কেটে গিয়ে গরমে তার কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো। মনি-ব্যাগ আনতেই সে ভুলে গেছে। পকেটে তার একটা রুমাল ছাড়া কিছু নেই। এমনকি, সিগারেটও নয়। না একটা দেশলাই। প্রিয়ার কাছ থেকে টাকা ধার নিতে এক দান্নুন্‌ৎসিয়োকে শোনা গেছে। এলেনরা ডুজে-র সঙ্গে যখন তাঁর প্রেম। ডুজে-র সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় তিনি বেড়াতে বেরোতেন। পাহাড়ের ধারে বনের বিরল পথ, পাশে-পাশে চলেছে একটি ঝর্না।

গানের মতো করে বলতেন : 'এলেনরা, আজ এই সন্ধ্যায় আকাশের লাল আর পাহাড়ের নীল আর বনের সবুজের সঙ্গে মিশে তুমি এক হ'য়ে গেছো। এই মুহূর্তে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তুমি ছড়িয়ে পড়লে; তোমাকে আলাদা ক'রে দেখতে পাচ্ছি না।' তারপর বলতেন : 'এলেনরা, আমাকে কয়েক লির‍্য ধার দিতে পারো?' তেমনি—গানের মতো ক'রে বলতেন—তা ঠিক। এমন ক'রে বলতেন যে এলেনরা আরো বেশি মুগ্ধ হ'তেন, তা ঠিক, আর সে-সব লির‍্য ফেরৎ দেয়া বা নেয়ার কথা দু'জনের কারো মনেই কোনোকালে উঠতো না, তা-ও ঠিক। তবু, সুনীলের মন এতে সায় দেয় না। খুব যে একটা এসে যায় তা নয়, কিন্তু কোথায় যে একটু খটকা লাগে।

'সঙ্গে একটি পয়সাও নেই তো তোমার? বেশ। আমি ঠিক এ-ই চেয়েছিলাম! চেয়েছিলাম ব'লেই কিছু বলিনি। যদি বলতাম, টাকা-কড়ি কিছু সঙ্গে এনো না, তাহ'লেই তুমি মনি-ব্যাগ আনতে কক্ষনো ভুলতে না। তা-ই নয়? তবু আমি আশাই করতে পারিনি যে সত্যি-সত্যি তুমি ভুলে' যাবে। যা চেয়েছিলাম, তা-ই হ'লো তো? প্রমাণ হ'য়ে গেলো, ঈশ্বর আছেন। হ'লো না?'

ট্যাক্সি বিদেয় ক'রে দিয়ে লুসি-ললিতা বললে, 'আর কী? চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

'এখনি ?'

'কেন নয় ? চা ? চা হবে। চলোই না।'

'কোথায় ?'

'তুমি যদি জি. কে. চেস্টর্টন হ'তে, তাহ'লে এ-কথা জিগেস করতে না।'

'আমি যদি জি. কে. চেস্টর্টন হ'তাম, লুসি-ললিতা, তাহ'লে আজ সকালে তুমি আমাকে ডেকে পাঠাতে না। ও একটা জীবন্ত কার্টুন। এত মোটা ভুঁড়ি যে ঠেলে-ঠুলে গাড়ির ভিতর ঢোকাতে হয়। তা-ও একবার ওর চাপে গাড়িসুদ্ধ ভেঙে পড়েছিলো। ফ্লীট্ ষ্ট্রীটের মধ্যে। ওর সঙ্গে ডুয়েল লড়তে হ'লে ওর পোশাকের উপর খড়ি দিয়ে লাইন এঁকে সীমা নির্দ্দেশ ক'রে না নিলে ওর উপর বেজায় অবিচার করা হয়। ইষ্টিশানে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে হ'লে ও বার-বার নিজের ওজন নিয়ে সময় কাটায়— "Profound results" পায় কিনা। ট্রেনে কোনো বই বা খবর কাগজ না-থাকলে পকেট-ভরতি ট্র্যামের টিকিটের বিজ্ঞাপন প'ড়ে জ্ঞান লাভ করে। জর্মন না-জানার দরুণ একবার এক ইহুদীকে ও দু' পেনি ঠকাতে বাধ্য হয়েছিলো।—'

'হয়েছে, হয়েছে, চলো এখন।—ও, তোমার একটা শাল চাই বুঝি ? আমার কথা যে তোমার কাছে কতখানি

মূল্যবান, তাই প্রমাণ করবার জন্য বুঝি ইচ্ছে করে গায়ের কাপড়টাও ভুলে' এসেছো ? দাঁড়াও একটু, এনে দিচ্ছি একটা।'

('লুসি-ললিতা তোমার আজ হয়েছে কী, বলো তো ? তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না ! টুর্গেনিভের নায়িকাদের মতো গম্ভীর ধরনের মেয়ে তুমি; তোমার মধ্যে এ-চঞ্চলতা কেন ? তোমার প্রকৃতির এই একটি দিক এতকাল সবার কাছ থেকে লুকিয়ে এলে ; আর আজ আমার কাছে আকস্মিক নবত্বে তা উদ্ঘাটিত হ'লো। আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। তোমাকে শাদা বা নীল বা ধূসর ছাড়া কখনো কিছু পরতে দেখি নি ; আর আজ তোমার শাড়ির ম্যাজেন্টায় বিয়ের রাতের মতো লঘু ইশারা। তুমি কখনো বেশি কথা বলতে না, বাজে কথা তো নয়ই ; আর আজ তোমার হাসিতে চঞ্চলতা, কথায় তরল অজস্রতা। একটি মেয়েকে জানতাম, বার্ন্-জোন্স্-এর আঁকা মেয়েদের মতো যার মুখ ম্লান, যার চোখে উৎসবের প্রদীপের মতো শান্ত উজ্জ্বলতা। সেই মেয়ের মুখে আজ রক্তাভ উত্তেজনা, সেই মেয়ে আজ এক টুকরো নদীর মতো টলমল করছে, ঝলমল করছে। তার চোখে গড়িয়ে চলেছে অন্ধকারের নিচে অন্ধকার ; এমনকি, তার এলোচুল আজ হঠাৎ বাঁধা পড়েছে খোঁপায়, সে খোঁপা উচ্চ-হাসির মতো উদ্ধত।

'কী ভাবছো? এই নাও শাল। এখন চলো। —ভয় নেই তোমার—তোমার সঙ্গে পালাচ্ছি না, বাড়ির সবাই জানে।'

*   *   *   *

রাস্তায় বেরিয়ে লুসি-ললিতা বললে, 'এসো খানিকটা হাঁটি। ঠাণ্ডায় হাঁটতে চমৎকার লাগে—না?'

'কেন জিগেস করছো, লুসি-ললিতা? লুসি-ললিতা, তুমি তো জানো, হাঁটতে আমি একেবারেই ভালোবাসিনা। পারিও না। তাছাড়া, কাল রাত্তিরে আমি সাড়ে-তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছি, এবং আজ সকালে আমি চা খাইনি। কখনো খাবো কিনা, লুসি-ললিতা, তা তুমিই বলতে পারো। তার উপর, তোমার কথা ভাবতে-ভাবতে এমন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম যে স্যাণ্ডেল প'রেই চ'লে এসেছি। পায়ে ঠাণ্ডা লাগছে। আর জানো তো, স্যাণ্ডেল প'রে এ-ঘর থেকে ও-ঘরের বেশি আমি যেতে পারিনে। তায় আবার পুরোনো স্যাণ্ডেল। যে-কোনো মুহূর্তে পট্ ক'রে ছিঁড়ে যাবে। আর তুমি আমাকে ফেলে হনহন ক'রে চ'লে যাবে এগিয়ে। আর আমি প্রসার্পিনার রাজ্যে নবাগত ভূতের মতো শুকনো মুখে, খালি পায়ে কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াবো। বরং সোজাসুজি বললেই পারো, "আমার হাঁটতে ভালো

লাগে, আমি হাঁটবোই। তাতে আর-কেউ বাঁচুক বা মরুক বা নরকে যাক, সে-ভাবনা আমার নয়।”

লুসি-ললিতা হেসে উঠলো।—‘প্রমাণ পেলাম, সুনীল, যে তুমি সত্যি-সত্যি চা খাওনি। নইলে কি আর এমন মেজাজ হ’তে পারে? নেশা করার ফল হাতে-হাতে পাচ্ছো তো? চা খাইনি তো আমিও। অথচ, আমি কি তোমার মতো ঝিমুচ্ছি? না, প্যানপ্যান করছি? কিন্তু তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, সুনীল, চা আমরা খাবো। খুব বেশি দেরিও নেই তার। ততক্ষণে সিগারেট ধরাতে পারো। আমার কথা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হ’য়ে সেটাও ফেলে’ আসোনি তো? যা ভেবেছি। আচ্ছা, যাও;—আমার কথা ভাবতে তোমার অন্যায়-রকম বেশি ভালো লাগে, তোমার এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই না-হয় করছি। দিচ্ছি সিগারেট কিনে—দেশলাইসুদ্ধু। এক ঘণ্টার মধ্যে যদি এক প্যাকেট না-ফুরোতে পারো, তাহ’লে বাকি সারাদিন তোমাকে সিগারেট না-খেয়ে থাকতে হবে। আর, যদি পারো, বাকি সারাদিন ঘণ্টায় এক প্যাকেট ক’রে পাবে। এই যাঃ, এ-দোকানটা খোলেইনি এখনো। রাস্তার ওদিকে আর-একটা আছে। চলো।...এই, এক প্যাকেট সিগারেট দাও তো—আর একটা দেশলাই।’...‘নাও, সুনীল।...খুচরো নেই?

আমার কাছেও নেই যে। রাখো তবে, টাকাটাই তুমি রাখো।' লুসি-ললিতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো।

উড়ে দোকানি ফ্যালফ্যাল ক'রে ওদের পিছনে তাকিয়ে রইলো। এমন বউনি ওর জীবনে আর হয়নি। আশা করা যায়, একদিনের মধ্যে ওর কপাল ফিরে গেছে।

* * * *

'গ্যাখো, সুনীল, আকাশের কী চমৎকার রং হয়েছে এখন। চাটগাঁর কথা মনে পড়ে না?'

সুনীল মুখ ফিরিয়ে পুবের আকাশের দিকে তাকালো। পুরু শেলের চশমা-জোড়া চোখ থেকে খুলে রুমাল দিয়ে মুছে চোখ থেকে খানিক দূরে ধ'রে তার পরিষ্কারত্ব পরখ করলো। তারপর ফের চশমা লাগিয়ে তাকালো আবার। প্রথমে মুখ ফিরিয়ে পুবের আকাশের দিকে। পরে তার পাশে লুসি-ললিতার দিকে। লুসি-ললিতার মুখে বকের পাখায় রোদের আলোর মতো হাসি ঝলমল করছে।

'সুনীল, তোমার চাটগাঁর কথা মনে পড়ছে না?'

'পড়ছে বইকি, লুসি-ললিতা। পড়ছে, কারণ সেটা সাত বছর আগেকার কথা। দূর অতীত কাছের অতীতের চাইতে অনেক কাছে। এটা একটা প্যারাডক্স হ'লো;— সুকুমার থাকলে জবাব দিতো, "কাছের ভবিষ্যৎ দূর

ভবিষ্যতের চাইতে অনেক দূরে।” কিন্তু তুমি জানো, লুসি-ললিতা, কথাটা প্যারাডক্স নয়। সত্যি। দু’মাস আগেকার চাইতে সাত বছর আগেকার কথা আমরা অনেক বেশি মনে করতে পারি। এবং অনেক স্পষ্ট ক’রে। সাত বছর আগে চাটগাঁ শহরে একটি ছেলে থাকতো। এবং একটি মেয়ে। পাশাপাশি দুটো টিলার উপর ছিলো ওদের বাড়ি। ওদের ঘরের জানলা দুটো ছিলো মুখোমুখি। ভারি ছেলেমানুষ ছিলো ওরা। যে-বয়সে ছেলেমানুষ হওয়া উচিত, সে-বয়েসে ছেলেমানুষ হবার মতো আজকালকার দিনে বিরল ক্ষমতা ছিলো ওদের। ওদের স্বাস্থ্য ছিলো ভালো, অবস্থা ছিলো ভালো। অল্প বয়সে ওরা ফ্রয়েড বা কার্ল মার্ক্‌স্ পড়েনি। কখনো পড়েছে কিনা, সে-বিষয়েও আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

‘রোজ সকালে—খুব সকালে, সূর্য ওঠবার আগে—ওরা দু’জনে বেরিয়ে পড়তো বাড়ি থেকে, তারপর একসঙ্গে হেঁটে-হেঁটে বেড়াতো। শুধু যে বেড়াতো, তা নয়। ছুটোছুটি করতো; ওদের হাসির আওয়াজে পাখিরা আরো জোরে উঠতো চেঁচিয়ে। সূর্যোদয়ের আগে ম্লান আকাশের নিচে শিশির-ভেজা শহর যেন রূপকথার বনদৃশ্যের মতো রূপালি-ধূসর; তখনকার মতো ওদেরও

পরি হ'তে বাধা নেই যেন। হঠাৎ চুপ ক'রে থেকে ওরা শুনতো ঝাউয়ের মর্মর ; মেয়েটি বলতো, অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকলে সমুদ্রের শব্দও শোনা যায়। ফেরবার পথে ওদের মুখের উপর ভোরের প্রথম আলো এসে পড়তো : হালকা ঠাণ্ডা আকাশ উত্তপ্ত রঙে লাল হ'য়ে উঠতো, বাইরের হাওয়ায়, রোদ্দুরে আর পরিশ্রমে লাল হ'য়ে উঠতো ওদের গাল—তারপর তু'বাড়ির যে-কোনো বাড়িতে ফিরে কাড়াকাড়ি ক'রে খাওয়া, গল্প, হাসি, চ্যাঁচামেচি। ভারি ছেলেমানুষ ছিলো ওরা।'

'ছাখো, সুনীল, এরই মধ্যে আকাশের রং মিলিয়ে গেছে ;—ভোরের আভা যত সুন্দর ততই তো ক্ষণিক। ওদেরও জীবনের ভোরবেলা কেটে গিয়ে পরিষ্কার আলো ফুটলো একদিন। ছেলেটি ছবি আঁকে। মেয়েটিও আঁকে, কিন্তু ওর যে ছবিতে কিছু হবে না, তা তো জানা কথা। ছেলেটির চোখে ছিলো মিকায়েলেঞ্জেলোর মতো লালচে ছিটে, আর মেয়েটির নিতান্তই সাধারণরকমের সুন্দর চোখ। তাই মেয়েটির কিছু হবে না ;—মানে, নিজস্ব কিছু হবে না। লাল-ছিটে-ওলা-চোখ আর্টিস্টের অনুপ্রেরণা জুগিয়ে নর-জন্ম ধন্য করবে মেয়েটি। মিকায়েলেঞ্জেলো আর ভিটোরিয়া কলোনা। ছেলেটি জীবনে প্রকাণ্ড সব দুঃখ পাবে, প্রকাণ্ড সব ছবি আঁকবে, প্রকাণ্ড

নাম রেখে যাবে, আর মেয়েটিকে প্রকাণ্ড সব চিঠি লিখে যাবে, ওর মরার পর প্রকাশিত হ'য়ে যা প্রকাণ্ড সব লোকদের বাহবা পাবে। কিন্তু, ক্রমে দেখা গেলো, ওর এই সব ধারণা বদলে আসছে। কিন্তু ঈশ্বর ওর প্রকাণ্ড চিঠি লেখবার বাসনা পূর্ণ করলেন। ক্রমে ওর মধ্যে সেই অনুভূতি জাগলো, সাধারণ ভাষায় যাকে বলে প্রেম। প্রেম আর প্রতিভা মন্ত্রণা ক'রে পরীক্ষায় ফেল করালো ওকে। আই.-এ. ফেল ক'রে—

'এল.-এ. ফেল। এল.-এ. ফেল বললে অনেক ভালো শোনায়। শুধু তা-ই নয়, এল.-এ. শুনলেই মনে হয়, পরীক্ষাটা ফেল করবারই জন্যে। ওতে পাশ করাই অগৌরব। এল-এ ফেল ক'রে ও কলকাতায় চ'লে এলো আর্ট-স্কুলে পড়তে। বছর খানেক পরে মেয়েটিও এলো। এই এক বছর ওরা চিঠি-লেখালেখি করলো। চিঠির পর চিঠি—

'প্রকাণ্ড সব চিঠি—'

'ছোটো-ছোটো সব চিঠি। ছোটো আর মিষ্টি। আঙুরের মতো। আঙুরের মতো সে-সব চিঠি বাক্সয় তোলা আছে। লুসি-ললিতা, হয়তো একদিন এমন দিন আসবে যেদিন তুমি চিঠিগুলি ফেরৎ চেয়ে পাঠাবে; আর সে—বোকা ছেলে—চাওয়ামাত্র বাক্সসুদ্ধু দেবে তোমার

হাতে তুলে। তার উপর অসীম ক্ষমতা তোমার, তুমি তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তা-ই করাতে পারো। কাল রাত্তিরে একটা ছবির কথা ভেবে সে ঘুমোতে পারেনি ; আর আজ ভোর না-হ'তেই তুমি তাকে ডেকে এনেছো। ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে আসছে, চা না খেয়ে সে চোখে অন্ধকার দেখছে, তার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। হাঁটতে সে একেবারেই পারে না, তার উপর তার পায়ে পুরোনো স্যাণ্ডেল—কখন ছিঁড়ে যায়, ঠিক নেই। তবু তাকে দিয়ে তুমি ঘণ্টায় তিরিশ মাইল বেগে হাঁটিয়ে নিচ্ছো। বার-বার তার হাই আসছে, কথা বলতে-বলতে বার-বার রাস্তার লোকের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগছে, তবু তাকে তুমি অনর্গল বকাচ্ছো। অথচ, যে-কথা বলতে সে উৎসুক ছিলো, কাল রাত্তিরের সেই ছবিটার কথা—তা-ই সে বলতে পারলো না। এখন আর পারবেও না। লুসি-ললিতা, তার উপর তোমার একটু দয়াও নেই। তা'র ইচ্ছে করছে, কোঁচার খুঁট পেতে ফুটপাতে শুয়ে পড়তে ; কিন্তু তুমি নিজে হাঁটতে ভালোবাসো—এবং পারো—ব'লে তার কথা একবার ভাবছোও না। সে বেঁচে আছে কিনা, তা-ও একবার জিগেস করছো না। ছেলেটাও বোকা—কথা বলতে-বলতে এলগিন রোডের মোড়ে এসে পড়লো। কিন্তু, লুসি-ললিতা, সব জিনিশেরই সীমা আছে ; সেই ছেলের

বোকামিরও। একটু পরেই সে বিদ্রোহ করবে, এর পরে সে আর কিছুতেই হাঁটবে না। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি হেঁটে পৃথিবী-ভ্রমণ করতে বেরিয়েছো। সুতরাং, লুসি-ললিতা, বিদায়।'

সুনীল থামলো।

'এই যে, ঠিক সময়ে আমাদের বাস্ এসে উপস্থিত। আবার প্রমাণ হ'লো, ঈশ্বর আছেন। তুমি আমাকে যত খুশি কিপটে মনে করতে পারো, সুনীল, কিন্তু ট্যাক্সি কিছুতেই হবে না। এইজন্যেই তো আমি চাইনি যে তোমার হাতে টাকা থাকে। জানো না তো, বাস্-এ চড়বার কী ভয়ংকর শখ আমার।'

বাস্-এ ব'সে সুনীল বললে, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

লুসি-ললিতা বললে: 'কোথায়? কে জানে কোথায়? তবে আমার যেন মনে হচ্ছে যে প্রথমে একটা রেঁস্তোরাঁয় ঢুকে চা খেয়ে নিলে মন্দ হতো না। সুনীল, তোমার খিদে পায়নি?'

সুনীল হিংস্রভাবে বললে, 'পায় আবার নি!'

'পায় আবার নি!' লুসি-ললিতা হাসলো। 'বেশ বলেছো। চা খেয়ে আমরা যাবো সোসাইটি অব ওরিএন্টাল আর্টের এগজিবিশন দেখতে।—'

'—সে আমি দেখেছি।'

'দেখেছি আমিও। কিন্তু তু'জনে একসঙ্গে তো দেখিনি। তারপর—তারপর কী করবো তা এখনো ভাবিনি। তুমি যদি বলো, তোমার ওখানেও যেতে পারি, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই তা বলবে না, কারণ—'

'লুসি-ললিতা, এটা একটা বাস্, এবং—'

'এবং আমি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা, আর তুমি একজন উঁচু দরের ভদ্রলোক। তা আমি জানি, এবং সেই জন্যেই তো এত আস্তে কথা বলছি যে তুমিও সব কথা শুনতে পাচ্ছো কিনা, সন্দেহ হচ্ছে। সেই জন্যই তো তোমার চোখের দিকেও তাকাচ্ছি না; রাস্তার দিকে তাকিয়ে তোমাকে কথা বলছি।...সুনীল, আজকের এই দিনের কতটুকুই বা আয়ু। শীতের ছোটো দিন আধখানা মোমের মতো দেখতে-না-দেখতে ফুরিয়ে যাবে। তারপর নামবে ঠাণ্ডা, ধূসর সন্ধ্যা; নামবে কুয়াশা। সেই কুয়াশায় তোমাকে হারিয়ে ফেলবো, বার-বার ডাকলেও আর জবাব পাবো না। এখনো তরুণ আছে দিন, এখনো উজ্জ্বল, কিন্তু সেই সন্ধ্যার কথা ভেবে এখনি আমার চোখ ঝাপসা হ'য়ে উঠছে। শীতের দিনগুলি এত সুন্দরই যদি হ'তে পারলো, তাহ'লে আর-একটু বড়ো হ'তে পারলো না কেন? আজ ভোরবেলা আমরা যদি একত্রই হ'তে

পারলাম, তা হ'লে সন্ধের সময় ছাড়াছাড়ি কেন হতেই হবে? কেন? কেন?'

লুসি-ললিতা চুপ করলো।

যেন ঐ 'কেন'-রই উত্তরে লুসি-ললিতা একটু পরে গুনগুন ক'রে বললো, ' "পথ বেঁধে দিলো বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দু'জন চলতি হাওয়ার পন্থী।" '

সুনীল কিছু বললো না।

ছোটো এগজিবিশন; একটিমাত্র ঘরেই কুলিয়ে গেছে। ক'জন লোকই বা এর খোঁজ রাখে—আর, রাখলেও, বড়ো দিনের কলকাতার অজস্র জাজ্বল্যমান আকর্ষণের মধ্যে ক'জনের এত গরজ যে গুটিকতক পিতলের বুদ্ধ আর খানকয়েক ছবি দেখতে আসবে। আর, তা-ও ইণ্ডিয়ান আর্টের ছাপ-মারা ছবি! বিদেশীরা ভাবে, ইণ্ডিয়া একটা দেশ, তার আবার আর্ট! স্বদেশীরা কিছুই ভাবে না—ছবি বলতে তারা বোঝে রেশমবসনা সুমেদিনী, যে-ছবির উদ্দেশে প্রমথ চৌধুরী একবার বলেছিলেন: 'জেনে খুশি হ'লাম, বাংলার ঘরে-ঘরে ম্যালেরিয়া নেই।' আবার তার প্রতিবাদস্বরূপ যে-একরকম ছবি আঁকা হচ্ছে যার সমস্তটাই ঝাপসা, সমস্তটাই অত্যন্ত ক্ষীণ ও ভঙ্গুর, তা

দেখে বলতে ইচ্ছা করে যে বাংলাদেশের ম্যালেরিয়া দেহ ছেড়ে মনেও সংক্রমিত হয়েছে। চোখে দেখতে যা ভালো লাগে, সেটাই যে ভালো নয়, এটাও একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কী।

চোখে দেখতে অবশ্য অবনীন্দ্র গগনেন্দ্রনাথের ছবিও ভালো লাগে ; কারণ তাঁরা একটা মৃত, পুরোনো হারানো, টেকনীকের উপর দাগা বুলোন না ; সত্যি-সত্যি ছবি আঁকেন। স্নীল আর লুসি-ললিতা তা জানে, তাই ওরা দ্বিতীয়বার তাঁদের ছবি দেখতে গেছে। পাব্লিক তা জানে না (পাব্লিক বলতে যাদের বোঝায়, তারা কী-ই বা জানে !), তাই দর্শকদের মধ্যে বলতে গেলে ওরা দু'জনই। ঘুরে-ঘুরে বার-বার দেখে, এবং কোনো-কোনো ছবি অনেকক্ষণ ধ'রে দেখে ওরা আড়াই ঘণ্টার উপর কাটিয়ে দিলে। ওরা কি হঠাৎ ভুলে' গেলো যে শীতের দিনগুলি ভারি ছোটো, ভারি ছোটো ?

অবনীন্দ্রনাথের বর্ষার দৃশ্যগুলির কাছে এসে লুসি-ললিতা বললে : 'বাঙালি হ'য়ে জন্মেছো ব'লে তোমার মনে কি দুঃখ আছে, স্নীল ? তাহ'লে এই ছবিগুলো দ্যাখো, সে-দুঃখ দূর হবে। অন্তত, এখনকার মতো। জানো, সেদিন প্রথম যখন এ-ছবিগুলো দেখলাম আমি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম—কতক্ষণ, মনে নেই। ভেবেছিলাম

রোজই এসে অনেকক্ষণ ধ'রে এই ছবিগুলি দেখে যাবো —বতিচেলির "জীবন-নৃত্যে"র সামনে যেমন ইজাডোরা ডানকান দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু আমি ইজাডোরা ডানকান নই, তাই সেদিনের পর এই আজ এলাম—তোমার সঙ্গে। আর এর পর আবার আসাও আমার হবে না। তার মানে, এ-ছবিগুলি আমার আর দেখাও হবে না—ছাপার কালিতে ছাড়া। কারণ, কয়েকদিন পরেই এগজিবিশন যাবে বন্ধ হ'য়ে; আর কোনো পাগড়ি-পরা গোঁফ-ওলা মহারাজা—নেহাৎই কতগুলো বাহুল্য টাকার বোঝা থেকে রেহাই পাবার জন্য অসম্ভব দাম দিয়ে ছবিগুলি কিনে নেবেন। আর আমি, আলস্যের চেয়ে বড়ো পাপ যে কিছু নেই, এ বিষয়ে জল্পনা করতে-করতে বুড়ো হয়ে যাবো।'

('তুমি কি জানো, লুসি-ললিতা, যে বতিচেলির নাম উচ্চারণ ক'রে তুমি আজ দ্বিতীয়বার আমাকে চাটগাঁর কথা মনে করিয়ে দিলে? তোমার মনে আছে, লুসি-ললিতা, আমি যে চিত্রকর হ'লাম, তার কারণ তুমি, তুমি আর বতিচেলি—বতিচেলির "জীবন-নৃত্য" ছবি? অবশ্যি ছবি আমি আগেও আঁকতাম; যা চোখে দেখতাম, তা-ই আঁকতাম—বেশির ভাগই মুখ, মানুষের মুখ। মানুষের মুখের চেহারা মনের চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতি মুহূর্তেই

বদলাচ্ছে, তাই একই মুখের দিকে লক্ষবার তাকালেও তা পুরোনো হয় না। ছবিতে, মুখের একবার যে-চেহারা করা গেলো, সেই চেহারাই প্রতিবার দেখতে হয়; তাই বার-কয়েক দেখেই অরুচি ধ'রে যায়। তখন আমি তা-ই মনে করতাম; এবং কোনো-কোনো ছবিসম্বন্ধে যে এ-কথা খাটে, তা-ও ঠিক। আবার, কোনো-কোনো ছবিসম্বন্ধে খাটেও না। মুখের ভাব ও দেহের ভঙ্গি চিরকাল ধ'রে অবিকল একই আছে, অথচ কেন যে লক্ষবার দেখলেও তা ফুরোয় না, পুরোনো হয় না, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম বত্তিচেলির "জীবন-নৃত্য" দেখেই। বুঝতে না-পেরে থাকলেও, অন্তত অনুভব করেছিলাম। তুমিই আমাকে সে-ছবি দেখিয়েছিলে। মনে আছে তোমার?

'আমাদের বাড়িতে খুব বড়ো, খুব মোটা, খুব ভারি একটা বই দীর্ঘ অব্যবহারের ধুলোর তলায় চাপা প'ড়ে ছিলো। রোজই বইটা চোখে পড়তো; কিন্তু কোনোদিন খুলে দেখা দূরে থাক, কাউকে ওটার পরিচয় জিগেস করবার কথাও আমার মনে হয়নি। একদিন, লুসি-ললিতা, রবিবারের অবসরের চাপে সারা বাড়ি ঝিম ধ'রে আছে—লুসি-ললিতা, তোমার মাথায় কী খেয়াল চাপলো, সেই প্রকাণ্ড বইটা মাথার উপর চাপিয়ে তুমি আমার

ঘরে এসে উপস্থিত হ'লে। রুদ্ধস্বরে বললে, "ছাখো, কী চমৎকার—"

'দেখা গেলো, বইটা ইটালিয়ান চিত্রকলার একটা ইতিহাস। ইতিহাসের পরিমাণ অল্পই, ছবিই বেশি। মলাট ওল্টাতেই যে ছবিটা বেরুলো, সেটাই বতিচেলির "জীবন-নৃত্য"। জানো, লুসি-ললিতা, আমার জীবনে সে যেন এক মহান আবিষ্কার। হঠাৎ আমার চোখের সামনে একটা তারা ফুটলো ; আকাশ থেকে নেমে এলো এক দেবদূত ; আমার মনের মধ্যে ঘুমোনো রাজকুমারীর মতো সৌন্দর্য চোখ মেললো। মুহূর্তের মধ্যে সতেরো বছরের একটি ছেলে যুবক হ'য়ে গেলো—আমি তা অনুভব করলাম।

'ছবি থেকে মুখ তুলতেই চোখ পড়লো তোমার মুখের উপর—আর আমি চমকে উঠলাম। বতিচেলির ছবি থেকে একটি মেয়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে—প্রথমটায় এমনি মনে হ'লো। লুসি-ললিতা, তুমি দাঁড়িয়ে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ছবি দেখছিলে—তোমার চোখে প্রগাঢ় তন্ময়তা—হয়তো একটু বিষাদ ; বিষাদ, এখন মনে হচ্ছে, "at the thought of the whole long day of love yet to come", তোমার কালো এলো চুল সারা পিঠে ছড়ানো, তোমার পাৎলা শরীরে বতিচেলির নরম সব

রেখা, ঢেউয়ের মতো তরল সব রেখা ; উৎসবের আলোর মতো তোমার দুই চোখ উজ্জ্বল। লুসি-ললিতা, তোমাকে সেই প্রথম দেখলাম, আর মনের মধ্যে একটা সমুদ্র কথা ক'য়ে উঠলো। অনুভব করলাম, আমি প্রেমে পড়েছি। আমার মধ্যে প্রেমের আর প্রতিভার একসঙ্গে বিকাশ হ'লো। তারই ফলে এল.-এ. ফেল ক'রে…')

'সুনীল, আমি বতিচেলির নাম করার পর থেকেই তুমি চাটগাঁর কথা ভাবছো—এক রবিবার সারা দুপুর ব'সে আমরা দু'জন ছবির পর ছবি দেখেছিলাম—সবার আগে বতিচেলি—সে-কথা ভাবছো। তাই, অবনীন্দ্রনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকলেও তুমি তা দেখছো না, এতক্ষণ আমি যা বলছিলাম, কিচ্ছু শোনোনি। তা-না-হয় না-ই শুনেছো, সুনীল, কিন্তু এই ছবিগুলি ভালো ক'রে দেখে নাও: এই বর্ষার দৃশ্যগুলি। সত্যিই বর্ষা।'

সুনীল বললো, 'জানো, লুসি-ললিতা, এক ভদ্রলোক যখনই কন্সট্যাবল-এর ছবি দেখতে যেতেন, ছাতাটা খুলে নিতেন। পাছে শিশির লেগে সর্দি হয়।'

লুসি-ললিতা বললো, 'ভারি তো কন্সট্যাবল। ও ইংরেজ না হ'লে আমরা কি ওর নামও জানতাম! কন্সট্যাবল-এর সমস্ত ল্যাণ্ডসকেপ একত্র করলে কি

এর একটি ছবির সমান হয়? একই রঙের কত রকম আভা! হঠাৎ দেখে মনে হয় না কি, একটার বেশি রং ব্যবহারই করা হয়নি? অথচ, খুঁজে ছাখো,—সবুজ আছে, নীল আছে, শাদা আছে—কী সুন্দর মিশেছে সব!'—লুসি-ললিতা, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো।

গগনেন্দ্রনাথের ছবির কাছে এসে উচ্ছ্বসিত হ'লো সুনীল। খালি সোনালি আর কালোয় করা 'Magic Casements'। 'Magicই বটে,' সুনীল বললে। সুনীল আরো অনেক কথা বললে। হঠাৎ ওর মুখ খুলে গেলো। ওর নিজের ছবির কথা। কাল রাত্রে যেটা ভেবেছে। এই রকম দৃঢ়তা, তুলির টানের এই অকুণ্ঠ নির্ভীকতা ওর কবে হবে? উজ্জ্বল, উদ্ধত রং অথচ দুঃসহ নয়। তীক্ষ্ণ স্পষ্টতা, অথচ মোহভরা। ওর ছবিও তা-ই হবে। লালে লাল ছবি। আগুনের লাল, সূর্যাস্তের লাল, সিঁদুরের লাল। লাল আর সোনালি। লোকে বলবে বড্ড চড়া। আসলে বিস্ময়কর। অসংকোচে বিস্ময়কর হবার সাহস ওর কাছে। মাঝে-মাঝে কালোও দরকার—এই রকম কালো। শক্ত, দানা-বাঁধা কালো। তরল নয়। ছবিটা তরল হবে না, হবে জমাট। বর্তুল নয়, কোণবহুল। এই রকম। রংগুলো একটার সঙ্গে আর-একটা মিশে যাবে না। প্রত্যেকটি আলাদা,

প্রত্যেকটি স্পষ্ট। অথচ, বৈষম্য নেই। এ-ছবিতে যেমন সোনালি আর কালো। Magic casements...শেষটায় সুনীল কীটস আবৃত্তি করলো—সমালোচকদের হাতে প'ড়ে কীটস-এর যে-দু'টি আশ্চর্য লাইন-এর জাত যেতে বসেছে।

শেষ পর্যন্ত শুনে' লুসি-ললিতা বললে : 'এসো বর্ষার ছবিগুলি আর-একবার দেখা যাক।'

* * *

বাইরে এসে লুসি-ললিতা বললে : 'চলো তোমার ওখানেই যাওয়া যাক।'

'আমার ওখানে ?'

'অবাক হচ্ছো কেন ? তোমার তেতলার ঘরটি বেশ লাগে আমার। চলো। পথে তুমি কিউবিজ সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা কোরো, নয়তো আমাকেই হবে কথা বলতে, আর বাস্-এর লোকেরা শক্‌ড্ হ'বে। মিছিমিছি শক্ করবার শখ আমার নেই। (একটা তৃতীয় শ্রেণীর pun হ'লো ; তোমাদের সুকুমার থাক্‌লে টুকে নিতো।) আমার যা কথা, তা না-হয় তোমার বাড়ি গিয়েই বলা যাবে। সেখানে "সে কথা শুনিবে না কেহ আর।"'

'দেখতে-দেখতে বেলা চড়লো—আর একটু পরেই তো বিকেল। বিকেল—এরই মধ্যে বিকেল। এতগুলো সময় খরচ হ'য়ে গেলো—আর এখনো তুমি ভাবছো তোমার ছবির কথা, আর আমি এমন-সব কথা ব'লে যাচ্ছি, যা কোনো বাংলা উপন্যাসের নায়িকা কখনো বলে না। সুনীল, আজ আমাকে উপন্যাসের নায়িকা মনে হচ্ছে না তোমার? একটু অবাক করা, একটু হিশেব-হারা, যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না? আমার কাছে অনেক-কিছুতেই অনেক-কিছু আসে যায়। যেমন, আজকের এই দিন। এর আর কতটুকুই বা হাতে আছে সুনীল। আধখানা মোমবাতি ফুরিয়ে এলো ব'লে; যতই শেষের দিকে এগোচ্ছে, ততই বেশি তাড়াতাড়ি পুড়ছে। মনের দুঃখে আমার বলতে ইচ্ছে করছে: Out, out brief candle। যেন আমার হুকুমেই ওটা নিববে।'

ওর ছবির তন্ময়তা থেকে উঠে এসে সুনীল বললো, 'আমার কাছে শেক্সপিয়র্ আওড়াচ্ছো কেন, লুসি-ললিতা? জানো তো, আমি এল. এ. ফেল।'

লুসি-ললিতা বললে, 'যা ঘটবেই, তা যেন আমাদের নিজেদের ইচ্ছেতেই ঘটছে—আমরা প্রায়ই এই ভাণ করি। তা-ই নয়, সুনীল?'

তারপর হঠাৎ : 'সুনীল, সুনীল, সুনীল।'

* * *

সুনীলের তেতলার ঘরটি তার স্টুডিও। দেয়ালের গায়ে ঠেশান দিয়ে রাখা আছে শেষ-করা, শেষ-না-করা, মাত্র-আরম্ভ-করা ছবি ; মেঝেতে স্তূপ-করা বই, পত্রিকা ; বইয়ের মলাটে সিগারেটের পোড়া দাগ, দেয়ালের গায়ে ধোপার হিশেব পেনসিলে লেখা। পুরোনো একটা সোফায় বসেছে লুসি-ললিতা, লাল শালটি পড়ে আছে পাশে, পশ্চিমের জানলা দিয়ে শীতের গাঢ় রোদ্দুর ঠিক তার পায়ের কাছে এসে পড়েছে। একটু দূরে এক চেয়ারে ব'সে সুনীল—জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। তাকে দেখে মনে হয়, ও-ঘরে যে আর-কেউ আছে, তা-ও যেন তা'র খেয়াল নেই। শরীরকে বিশ্রাম করতে দিয়ে তার মন ঘুরে' বেড়াচ্ছে—যেমন এবং যেখানে খুসি। পুরুশেলের চশমার পিছনে ওর বড়ো-বড়ো চোখে মিকায়েলেঞ্জেলোর মতো লালচে ছিটে ; ওর ফেঁপে-ওঠা বাদামী চুলের আশে-পাশে সিগারেটের নীল, মিহি ধোঁয়া। তেতলার ছোটো ঘরটি দুজনের দীর্ঘ নীরবতায় ভারাক্রান্ত। বাইরে শীতের ছোটো দিন মরতে বসেছে।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙ্গে লুসি-ললিতা বললে, 'তোমাকে আমার একটা কথা বলবার আছে, সুনীল।'

সুনীল চোখ সরিয়ে আনলো, কিছু বললো না। একটু পরে লুসি-ললিতা আবার বললে: 'আজ সকালে তুমি আমাকে দেখে অবাক হয়েছিলে, না? ম্যাজেণ্টা মেয়ে—শাড়িতে, হাসিতে, কথায়। তুমি আমাকে নীল ব'লে জানতে; অপরাজিতার ঘন নীল—ঘন বর্ষায় যা ফোটে। আসল কথা এই, তুমি আমাকে ঐ ভাবে দেখতে ভালোবাসো; তাই তুমি চট ক'রে ম্যাজেণ্টার সঙ্গে আমাকে মানিয়ে নিতে পারলে না। কিন্তু মানায় নি কি? আশ্চর্য, শুধু শাড়ির রঙে মানুষের চেহারা কত বদলে যায়। এমনকি, চরিত্রও। অন্তত, অন্যের কাছে তা-ই মনে হ'বে। তোমার যেমন আজ মনে হচ্ছিলো, আমি বদলে গিয়েছি।' লুসি-ললিতা চুপ করলো। হয়-তো একটু পরেই সুনীল কিছু বলতো, কিন্তু হঠাৎ লুসি-ললিতা আবার বলতে লাগলো:

'অনেক মেয়ে ছিনিমিনি খেলতে ভালোবাসে। জটিলতাতেই তাদের সুখ। কারণ, অনেক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে—এ-কথা ভেবে নিজেকে ওরা বাহবা দিতে পারে। কিংবা, ছাড়াতে না-পারলে—বিষম মুশকিলে প'ড়ে অন্য লোকের বাহবা পেতে পারে। আমি সে-রকম নই। আমি প্রাঞ্জল। এই তোমাকে দিয়েই ছাখো না, সুনীল। আমি ইচ্ছে ক'রে কখনো কোনো ঘোর তৈরি করিনি।

জ্ঞানত ভুল বুঝতে দিইনি তোমাকে। তোমার কাছ থেকে বেশি আদায় করবার লোভে—যা দিতে চেয়েছো, তা ফেরাইনি। সাত বছর ধ'রে আমাদের চেনাশোনা ; এই দীর্ঘ সময়ে একদিনের জন্যে কোনো গোলমাল বাধেনি, বাধতে দিইনি। স্বেচ্ছায় আমরা দু' জন মিলেছিলাম। বাইরে থেকে কোনো বাধা ছিলো না, কোনো উপকরণের অভাব ছিলো না, দুঃখের এতটুকু আভাস ছিলো না কোনোখানে। বদ্‌মেজাজি বাপ নেই, সন্দিগ্ধ চরিত্রের মা নেই, টাকার অভাব, শারীরিক অসুখ, দীর্ঘকালের জন্য ছাড়াছাড়ি—কিচ্ছু নেই। এমনকি, কেলেঙ্কারিও পর্যন্ত না। হঠাৎ মনের অবস্থার পরিবর্তন বা তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবও হয়নি। হ'লেও বা কী হ'তো ? ইতিমধ্যে অন্য-কোনো মেয়ে যদি তোমার জীবনে আসতো, সুনীল, তাহ'লে আমি অনায়াসে তোমাকে ছেড়ে দিতাম ; কাঁদাকাটি, অভিমান, রাগ—কোনো রকম হৈ-চৈ করতাম না। তোমাকে অনায়াসে ছেড়ে দিতাম, সুনীল ; কারণ, আমি সমস্যা ভালোবাসি না। কিন্তু সুনীল, তুমি আমাকেই যথেষ্ট ভালোবাসতে পারলে না, অন্য মেয়েকে ভালোবাসবে কী ক'রে ? আমি আছি, এই একটি কথা তুমি চিরকালের মতো ধ'রে নিলে, তোমার জীবনে তাকে সত্য করবার কোনো চেষ্টা করলে

না। তবু তো আমি সেই আমিই রইলাম, আর তুমিও তা জানতে—তাই নিশ্চিন্ত মনে তুমি ছবিতে ডুবে রইলে; যখনই দরকার হ'বে, লুসি-ললিতা তো আছেই। লুসি-ললিতাকে দরকার ; কারণ তাহ'লে কাজে আরো বেশি উৎসাহে মন দেয়া যায়। আধুনিক মেয়েরা তোমার এই নিশ্চিন্ততায় ঘোর আপত্তি করতো। নিশ্চিন্ত থাকতে দিতো না তোমাকে। লুসি-ললিতাকে না হ'লে যে তোমার চলে না ; ও যে শুধু অবসরের বিলাস নয়, প্রাত্যহিক জীবনের একান্ত প্রয়োজন, তা তোমাকে বুঝিয়ে ছাড়তো তারা। কিন্তু আমি তা করিনি। তুমি যেমন, তোমাকে ঠিক তেমনি গ্রহণ করেছিলাম। নালিশ করিনি। তোমার যথাসময়ে তুমি আমার কাছে আসতে পেরেছো ; কিন্তু আমার যথাসময়ে তুমি হয়তো ছবি আঁকছো বসে, কি ছবির কথা ভাবছো। আমাকে লক্ষ্যই করোনি—যেমন একটু আগে করছিলে না। এখন করছো, কারণ এখন আমি এমন-সব কথা বলছি, যা কোনোদিন আমার মুখে শুনবে ব'লে আশা করো নি, যা আমিও কোনোদিন বলবো ব'লে ভাবিনি। অ[illegible]ও যে বলতাম, তা নয়। কিন্তু এখন বলছি, কারণ শীতের বিকেলে ঘরের আলো ক'মে এসেছে। তা ছাড়া, আমি তোমার মুখ দেখছি না—আর তুমিও যে আমার মুখ

দেখছো না, তা আমি জানি। জানলা দিয়ে তুমি বাইরে তাকিয়ে আছো, ওদিকে না-তাকিয়েও আমি তা বুঝতে পারছি। তোমাকে বলছি ব'লে মনে হচ্ছে না; মনে হচ্ছে নিজের মনেই বলছি।'

লুসি-ললিতা বললো, 'সুনীল, আমি কোনোদিন তোমার স্বভাবে কোনো দোষ ধরিনি, কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। আজকালকার দিনে এটা মেয়েলি; কিন্তু যে মেয়ে, মেয়েলি হ'তে তার লজ্জা কী? জানি, আপত্তি করা বৃথা। নিজেকে বদ্‌লাতে তুমি পারো না। আমি যেমন পারি না। সকাল-বেলাকার ম্যাজেণ্টা মেয়ে এখন কোথায়? তার দিকে একবার তাকাও, সুনীল; তোমার করুণা হবে। তার চোখ এই আসন্ন শীতের সন্ধ্যার মতো ঝাপসা হ'য়ে উঠছে—আজ শীতের এই সন্ধ্যায় সে তোমাকে ছেড়ে যাবে ব'লে।'

লুসি-ললিতা বললো, 'সুনীল, তুমি আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসোনি, কিন্তু সে-তোমার দোষ নয়। এর বেশি ভালোবাসার ক্ষমতা তোমার ছিলো না। তুমি আর্টিস্ট; তোমার চোখে মিকায়েলেঞ্জেলোর মতো লালচে ছিটে; কোনো একদিন তুমি গগনেন্দ্রনাথের তুল্য শিল্পী হবে, কিন্তু সে-জন্য তোমাকে অনেক দাম দিতে হবে, সুনীল, এখন

থেকেই দিতে হচ্ছে। তোমার সেই সব-হারাবার যজ্ঞে প্রথম উৎসর্গ করলে আমাকে। তুমি আর্টিস্ট ; সব সময়েই তুমি আর্টিস্ট। আর্টিস্ট হিশেবে এ-ই তোমার শক্তি, আর মানুষ-হিশেবে এ-ই তোমার দুর্বলতা। আর্টের রাজ্যে তোমার বেশ আরামেই কাটে, কিন্তু সেখানকার পাৎলা হাওয়ায় মানুষের দম আটকে আসে—বিশেষ ক'রে মেয়েদের। কিন্তু তুমি তা কখনো লক্ষ্য করো না, করতে পারো না। কারণ তোমার ছবির চিন্তা প্রকাণ্ড আলোর মতো বাইরে থেকে তোমাকে আড়াল ক'রে রাখে ; সে-আলো এমন উজ্জ্বল যে তোমার চোখে তা ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছে ; ইচ্ছে করলেও বাইরের কোনো জিনিশ দেখতে পাবে না তুমি। এক কথায়, আমাদের পরিচিত পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা থেকে তোমার হয়েছে নির্বাসন। একদিন তোমার তুলির টানে গগনেন্দ্রনাথের উজ্জ্বল দৃঢ়তা আসবে—সে-ই তোমার গৌরব। কিন্তু একদিক থেকে তুমি যেমন মানুষের চেয়ে বেশি হবে, তেমনি—সেই কারণে—অন্য দিক থেকে তোমাকে মানুষের চেয়ে কমও হ'তে হবে। অনেক স্বাভাবিক সুখদুঃখের কোমল আলো-ছায়া তোমার জীবনের বাইরে চ'লে যাবে। এখন থেকেই যাচ্ছে। স্বর্গকে লাভ ক'রে তুমি হারাবে পৃথিবীকে—পৃথিবীর সঙ্গে আমাকে। খুব যে জিৎবে,

তা নয়। বরং, সে-ই হবে তোমার লজ্জা। আবার, সেই লজ্জাই তোমার গৌরব।'

লুসি-ললিতা বললে: 'জানো স্নুনীল, তোমার ভালোবাসাটা কী-রকম? পোশাকি কাপড়ের মতো। রবিবারে প'রে বাকি সপ্তাহের মতো ইস্ত্রি ক'রে বাক্সয় তুলে রাখার জিনিশ। সেখানে ধুলো অবশ্যি লাগে না, কিন্তু হাওয়াও লাগে না। হাওয়া—জীবন-ধারণের পক্ষে যা সব চেয়ে দরকার। তোমার মত যারা আর্টিস্ট নয়, তাদের ওতে মন ভরে না। তুমি কখনো নিজেকে ছেড়ে দাও না, অভিভূত হও না—কোনো অসংগতি বা বাড়াবাড়ি তোমাতে নেই। সংযম—লোকে বলবে। কিন্তু সংযম না দুর্বলতা কে জানে। প্রবল আবেগ তোমার মধ্যে নেই, স্নুনীল। তোমার মন কখনো উদভ্রান্ত হয় না, যাদের হয়, তারা বারে-বারেই ব্যর্থ হয় তোমার কাছে। তোমাকে অনেক, অনেক বেশি ভালোবাসতে পারতাম, তুমি দিলে না। এক মুঠোর বেশি ভালোবাসা তোমাতে ধরে না, স্নুনীল; তুমি তা চাও না, আর চাও না ব'লে কোনো অভাববোধও নেই তোমার। একজন মানুষ আর একজন মানুষকেই ভালো-বাসতে পারে, প্রকাণ্ড একটা আলো-কে নয়। তুমি ঈশ্বরের কাছে তোমার আত্মা বেচে দিয়েছো, স্নুনীল; তোমাকে ভালোবাসাও যায় না। তুমি নিজেই সে-পথ বন্ধ ক'রে

দিয়েছো। তুমি জানোও না, সুনীল, আমি তোমাকে কত ভালোবাসতে পারতাম—ভাবতেও পারো না। অত্যাচারের মতো হিংস্র ভালোবাসা ;—আবার, ঘুমের মত নরম। রুগ্ন শিশুর মতো করুণ অসহায় ;—আবার, বিশাল সেনাবাহিনীর মতো ক্ষমতায় অপরাজেয়। তুমি তা ভাবতেও পারো না, সুনীল।'

লুসি-ললিতা বললে, কিন্তু তুমি তা দিলে না; খানিকদূর এসেই পথ দিলে বন্ধ ক'রে। আর,আমার মধ্যে অনেক ভালোবাসার অপচয় হ'তে লাগলো। ভালোবাসার অপচয়ের মতো এমন করুণ অপচয় আর নেই, সুনীল। যতই গায়ে-না-মাখার চেষ্টা করো, শেষ পর্যন্ত অসহ্য হ'য়ে উঠবেই। একটা ব্যবস্থা না-করলে বাঁচবে না। সে-ব্যবস্থা যদি বিয়েও হয়, তবু। সেইজন্যই তো আমাকে বিয়ে করতে হচ্ছে, সুনীল। কাকে, সে-কথা শুনে আর কী করবে। সে যখন এসে আমাকে চাইলো, আমার পক্ষে ফেরানো অসম্ভব হ'লো, অসম্ভব। ভালোবাসার অপচয় আর সহ্য করতে পারছিলাম না আমি। সে আর্টিস্ট নয়, ইঞ্জিনিয়ার ; তাই তাকে ভালোবাস[illegible] সে তা লক্ষ্য করবে। আজ সাড়ে-ছ'টার সময় সে আমার কাছে আসবে, আমার বাড়িতে। তাই, যে-সন্ধ্যায় লোকেরা মিলিত হয়, সেই সন্ধ্যাতেই

হ'বে আমাদের ছাড়াছাড়ি—তোমার আর আমার। শীতের ছোটো দিন ফুরিয়ে এলো ; একটু পরেই আমি উঠবো, উঠে চ'লে যাবো। হয়তো তুমি আমার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত যাবে ; না-হয়—যা বেশি সম্ভব—এ-ঘরে অন্ধকারে ব'সে থাকবে ; মুখের সিগারেটটা ধরাতেও তোমার মনে থাকবে না। ব'সে-ব'সে ভাববে—এই ভালো হ'লো, এ-ই তুমি চেয়েছিলে। যা ঘটবেই, তা যেন আমাদের নিজেদের ইচ্ছেতেই হ'লো, আমরা প্রায়ই এ-ভাণ করি কিনা। আবার, যা আমাদের ইচ্ছাতেই ঘটলো, তা যেন দৈবাৎ হ'য়ে গেলো—এ-ভাণও করি। আমার অবস্থায় অন্য-কোনো মেয়ে যা করতো। কিন্তু তুমি জানো, সুনীল, ভাণ আমি ভালোবাসি না। যা হচ্ছে, তা আমার নিজের ইচ্ছেতেই হচ্ছে, এ-কথা স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠিত নই। এ-ঘরে অন্ধকারে একা ব'সে-ব'সে তুমিও কোনো ভাণ কোরো না, সুনীল। যদি মন-খারাপ হ'য়ে থাকে, মন-খারাপ ক'রেই থেকো। তাতে কোনো অপৌরুষ নেই। আর, যদি সময় পাও, তাহ'লে ভেবো : সাত বছরের চেনাশোনার পর আজকের এই শীতের সন্ধ্যায়, ঠিক যখন আমাদের মিলনের সময়, তখনই কেন আমাদের বিচ্ছিন্ন হ'তে হ'লো ? কেন বাইরের কুয়াশায় আমি গেলাম হারিয়ে ? কেন তোমার

তেতলার এই ঘরটি এখনো কোনো রাত্রিতে আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে না?'

সুনীল বললো, 'কিন্তু আমি তো তোমাকে হারাতে পারি না, লুসি-ললিতা, আমি আছি—এই আমার মধ্যেই তুমি আছো।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ:
নিরঞ্জন রায় আর উমা

শর্বরী রায়ের ভাই নিরঞ্জন রায়, আর নিরঞ্জন রায়ের প্রিয়া উমা—উমা চ্যাটার্জি, অধুনা উমা দেবী। কোন্—? হ্যাঁ, সেই স্বনামধন্যা উমা দেবী, যার নাম না দেখে আজকাল খবরের কাগজ খোলবার উপায় নেই। সেই উমা দেবী (চ্যাটার্জি) নিরঞ্জন রায়ের প্রিয়া—মানে, নিরঞ্জন ওকে ভালোবাসে। উমাও নিরঞ্জনকে ভালোবাসে কিনা, এ-বিষয়ে এখন মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত প'ড়ে পাঠক নিজেই বিচার করতে পারবেন।

উমা চ্যাটার্জি—খবরের কাগজে ওর কথা উঠতে আরম্ভ না-করা পর্যন্ত ও দেবীত্বে আপন্ন হয়নি; এবং

আমিও খবরের কাগজের রিপোর্টার নই; সুতরাং আমি ওর সাবেকি এবং আসল নামকেই আঁকড়ে ধরলাম—উমা চ্যাটার্জির কথা আপনারা কে-ই বা না জানেন! নতুন ক'রে পরিচয় দেয়া কি বাহুল্য হবে না? ওর চেহারার যে একটা বর্ণনা লিখবো, তারও উপায় নেই, কারণ আপনারা অনেকেই ওকে সশরীরে দেখে থাকবেন, এবং সে-সৌভাগ্য যাঁদের হয়নি, তাঁরা নিদেন ওর ছবি না দেখেই পারেন না। কাজে-কাজেই উমাকে আপাতত বাদ দিয়ে রাখি। আপাতত নিরঞ্জনের সঙ্গে আপনাদের ভালোমত পরিচিত করিয়ে দিই;—কী বলেন? এর আগে আপনারা একবার শুধু ছেলেটিকে দেখেছিলেন, তা-ও সন্ধার অন্ধকারে, দেশলাইয়ের ক্ষণিক আলোয়। আপনারা হয়তো তা ভুলেও গেছেন। আমার মনে কিন্তু নিরঞ্জন রায়ের মুখ ছাপ রেখে গিয়েছিলো—দেশলাইর লাল আলোয় মুহূর্তের জন্য দেখা মুখ। তখন থেকেই আমার ইচ্ছে, ওর সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। কিন্তু ইতিমধ্যে জুটলো এসে অতনু আর সাবিত্রী বোস, জুটলো সুনীল আর লুসি-ললিতা। ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে—চলুন এখন নিরঞ্জনের কাছে; দেখা যাক, একটা গল্প তৈরি হ'তে পারে, এমন জিনিশ ওর ভিতর আছে কিনা।

শর্বরী রায়ের—এবং নিরঞ্জনের—বাড়ি তো আপনাদের চেনাই আছে—কালিঘাট ও ট্রাম ডিপো পেরিয়ে রাস্তার পুব দিকে গ্রীক গির্জা, তার পাশ দিয়ে গেছে ছোটো এক রাস্তা, সেই রাস্তার শেষ বাড়িটা ওদের ; ছোটো, একতলা, লাল বাড়ি। শর্বরী যখন মন খারাপ করে মুসৌরী চ'লে না যায়, বা নিরঞ্জনকে যখন ডাক্তাররা ধ'রে-বেঁধে হাজারি-বাগ চালান না করে, তখন ওরা দু'জনে ও-বাড়িতেই বাস করে ; মুসৌরি (বা হাজারিবাগ) যেতে হ'লে দু'জনে একসঙ্গেই যায়। ভাই-বোন দু'জনেই সাহিত্য আর প্রেমের চর্চা করে—তাই ওদের চাকর-বাকররা কিছুদিন পরেই পোস্টাপিশ থেকে টাকা তুলে এনে ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্কে করেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলবে। তবু ঈশ্বর ওদের স্বচ্ছন্দ অর্থ দিয়েছিলেন ব'লে স্বচ্ছন্দে দিন চ'লে যায়।

একদা—নিরঞ্জনের বয়স তখন আঠারো—ডাক্তাররা ওর ফুসফুসে টি. বি. সন্দেহ করেন। সেই সময়ে পুরো এক বছর হাজারিবাগে কাটিয়ে নিরঞ্জন এতদূর সুস্থ হ'য়ে কলকাতায় ফিরে এলো যে ডাক্তাররা ওকে বাকি জন্মের মত টি. বি. থেকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। নিরঞ্জন উল্লসিত হ'য়ে সিগারেট ধরলে—নেশা পাকা হ'তে বেশি দিন লাগে না—দেখতে-না-দেখতে প্রত্যহ পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশটি সিগারেট ধ্বংস করা ওর কায়েনি হ'য়ে দাঁড়ালো। এই

ধূম-বাহুল্যের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত ওর ফুসফুস মাঝে-মাঝে প্রতিবাদ করে, এবং তারই ফলে ওকে আবার যেতে হয় হাজারিবাগ—বা পুরী ; শর্বরী যায় সঙ্গে। নিরঞ্জন অবশ্য প্রত্যেকবারই ঘোর আপত্তি করে, ইংরেজিতে বলে যে নিজের যত্ন নিজে নেবার মতো বয়েস তার হয়েছে, কখনো বা এমনও ইঙ্গিত করে যে হাজারিবাগে (বা পুরীতে—যখন যেমন) ভগিনী-সান্নিধ্য তার পক্ষে অবিমিশ্র আনন্দ-উৎস না-ও হ'তে পারে ; কেননা, সুলেখা (বা সুলতা —যখন যেমন) বলেছে—সুলেখা (বা সুলতা) কী বলেছে তা আর বলার দরকার করে না। শর্বরী জানে যে সুলেখা (বা সুলতা) সম্পূর্ণ কাল্পনিক। নিরঞ্জন জানে, সুলেখার (বা সুলতার) কাল্পনিকত্ব শর্বরী বুঝতে পেরেছে ; সুতরাং আলোচনা এখানেই অচল হ'য়ে পড়ে।

আসল কথাটা কী জানেন ? একবার নিরঞ্জন একটা স্যুটকেসের চাবি লাগাবার আধঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা ক'রে পরিশেষে তালা-টালা ভেঙে নিশ্চিন্ত হয়েছিলো ; আর-একবার কায়দা ক'রে একটা জ্যামের টিন খুলতে গিয়ে চক্ষের নিমেষে নিজের আঙুল কেটে ফেলেছিলো ; এবং আর-একবার শখ ক'রে একটা স্টোভ ধরাতে গিয়ে স্পিরিটের বোতল আর দেশলাইয়ের বাক্স আর স্টোভের কলকব্জা নিয়ে চল্লিশ মিনিট ধ'রে যে এলাহি কাণ্ডটা

করেছিলো, তাতে ওর প্রাণ যে বেঁচেছে, এ-ই আশ্চর্য। দেখছেন,নিরঞ্জন রায় একেবারেই অপদার্থ—লোকে ব'লবে। অন্তত, কোনো-কোনো বিষয়ে যে, তা ঠিক। যেমন ধরুন, বেরোবার আগে কোনোকালে ও ওর জামা-কাপড় খুঁজে পায় না; পাঞ্জাবির পিঠ আধ-হাত ছেঁড়া থাকলেও তা টের পায় না, কেননা 'ঈশ্বর তো আর মানুষের পিছনে চোখ দেন নি।' একবার হয়েছিলো কী জানেন? ওর পাঞ্জাবি—এবং পাঞ্জাবির নিচে গেঞ্জি ছিলো ঠিক একই জায়গায় ছেঁড়া। ছোট, গোল ছেঁড়া—একটা পেন্সিলের বেশি চওড়া নয়—চমৎকার neat ছেঁড়া। আমরা সবাই অবাক! প্রাণান্ত চেষ্টা ক'রেও গায়ের দুটো জামা একই জায়গা অমন সুন্দর ক'রে ছেঁড়া সম্ভব কিনা, সুকুমার সে-বিষয়ে গবেষণা করলো। গবেষণার শেষে সুকুমার হেসে উঠলো, অমিতা চন্দ হেসে উঠলো। অতনুর ফর্শা মুখের পক্ষে যতটা কালো হওয়া সম্ভব, তা সে হ'লো। লজ্জায়। ও এতদিন ধ'রে বেশভূষার চর্চা করছে, কিন্তু গায়ের দুটো জামাই যে ঠিক একই জায়গায় ছেঁড়া থাকতে পারে, এ-সম্ভাবনা ওর কদাচ মনে হয়নি। তা-ও অমন গোল, অমন ছোটো, অমন পরিষ্কার ছেঁড়া। হাতের কনিষ্ঠা ঠিক এক কড়া অবধি ঢুকে যায়; অবাধে ওর পিঠে গিয়ে ঠেকে। আশ্চর্য, ছেঁড়া! আশ্চর্য,

আমাদের কাছে। আমরা—অমিতা আর সুকুমার আর অতনু—এরা আর ওরা। কিন্তু শর্বরীর কাছে নয়। বেশভূষা বিষয়ে সাধারণ লোকের কাছে যত রকম অসাধ্য-সাধন আছে, শর্বরী জানে—নিরঞ্জনের কাছে সে-সব জল-ভাত। উদাহরণ! চৌরঙ্গিতে একবার ওকে দেখা গিয়েছিলো—ছ'পায়ে ছ'রকমের স্যাণ্ডেল। প্রায় একই রকম অবশ্য—চট ক'রে দেখলে তফাৎ বোঝা যায় না। আর, চট ক'রে তফাৎ বোঝা না গেলেই হ'লো। এটা হ'চ্ছে নিরঞ্জনের সাফাই। সাফাই নিরঞ্জন দেয়, সব সময়। কারণ মনে-মনে সুবেশ হবার ভয়ানক লোভ ওর। গোপনে কঠোর তপস্যা চলে। গোপনে পাউডরও মাখা হয়। অবশ্য মাখাটাই গোপন হয়, পাউডরটা নয়। কেননা, নিরঞ্জন ঘাড়ে, গলার ভাঁজে, চোখের কোলে, নাকের আশে-পাশে শাদাটে পোঁচ নিয়ে ড্রেসিং রুম-এর সুগন্ধি গোপনতা থেকে বেরিয়ে আসে। শর্বরীকে বলতে হয়: 'ত্যাখো দাদা, যদিও মুখে আমরা বলি পাউডর-মাখা—আসলে তা হচ্ছে মাখা এবং মোছা।' পরে, দ্বিতীয়—এবং কঠিনতর—কাজটা শর্বরীকেই করতে হয়। কী-ই বা না করতে হয় শর্বরীকে—ওর এই ছোটো-ভাই-দাদার জন্য। বয়সে নিরঞ্জনই অবশ্য বড়ো—মনে-মনে যতই অনিচ্ছা থাক একথা মানতেই হবে আপনাকে। কেননা,

নিরঞ্জনের জন্ম উনিশ-শো-পাঁচে, আর শর্বরীর আটে ; এবং পাঁচ যে আটের আগে, এ-বিষয়ে সন্দেহ করা বৃথা। সুতরাং প্রমাণ হ'লো, বয়সে নিরঞ্জন বড়ো ; মোটে তিন বছরের হ'লেও, বড়ো। কিন্তু, দেখতে—শর্বরীকে ওর দাদার চাইতে অন্তত পাঁচ বছরের বড়ো দেখায়, কেননা একদা কোনো বোকা-বুদ্ধিমান বলেছিলেন : "Appearances are deceptive"। বোকা, কারণ appearances deceptive নয়ও। তাই, আসলে শর্বরীই বড়ো—অনেক বড়ো ; নিরঞ্জনের ও দিদি তো বটেই, সময়-সময় মা-ও। নিরঞ্জনের সম্পর্কে নিজেকে ওর প্রায়ই মা মনে হয়। কোনো-কোনো বিষয়ে ও এমন অকর্মণ্য—এমনকি, অসহায়। নিজের এই শৈশবাবস্থা নিরঞ্জনের পৌরুষে ঘা দেয়—সবার মতো ও-ও যে একজন সাবালক এবং সবল পুরুষ, তা প্রমাণ করবার জন্য মাঝে-মাঝে ও এমন-সব কাণ্ড করে—যা যতদূর হাস্যকর হ'তে হয়। আমাদের ঠাট্টাও ওকে কম সইতে হয় না ;—সুকুমারের ঠাট্টা—অন্ধকারে আকস্মিক আলোর মতো যা মুহূর্তের মধ্যে ওর মানসিক ভূগোলের প্রত্যেকটি রেখা উদ্‌ঘাটন ক'রে মিলিয়ে যায় ; ফুরফুরে অমিতার ফুরফুরে ঠাট্টা, আলগোছে ওর মনের উপর যা আদরের মতো এসে পড়ে, যার ইংরিজি নাম সহানুভূতি। 'Serve him right'—অতনু বলে—'যেমন নিজেকে ও সং

সাজায়, তেমনি ফলও পায় হাতে-হাতে। কেন ও চুপচাপ ভদ্রলোকের মতো থাকতে পারে না?' কিন্তু অতনু জানে না যে ওর অস্তিত্বহীন সাবালকতার ছটফটানি আমাদের কাছে এলেই আরম্ভ হয়; বাড়িতে, শর্বরীর কাছে ও চুপচাপ ভদ্রলোকের মতোই থাকে—মানে, শিশু হ'য়েই থাকে। শর্বরীর কাছে ও যা। তাই, শর্বরী যখন ওর শক্ত, মোটা-মোটা, ঈষৎ-কোঁকড়া অবাধ্য চুলগুলিকে গায়ের জোরে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করে, ও লক্ষ্মী ছেলের মতো মাথা নিচু ক'রে (কারণ, নিরঞ্জন এত লম্বা যে শর্বরীর মাথা ওর বুকের কাছে প'ড়ে থাকে), অনেকখানি নিচু করে, তবু শর্বরীকে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়—ওর মাথা এতই দূরে। আর, ওর চোখা নাক অবাঞ্ছিত আগন্তুকের মতো শূন্যে ঝুলতে থাকে। বড়ো বেশি চোখা—অতনু বলে। চোখা অতনুর নাকও—চোখা আর ছোটো—গ্রীক নাক, লিরিক অ্যাপোলোর নাক—নাকের সেরা নাক। কিন্তু, নাকের ব্যাপারে ঈশ্বর কতদূর করতে পারেন, তারই প্রমাণ হ'লো নিরঞ্জনের নাক। চোখা আর লম্বা। মাঝখানে ব'সে (না দাঁড়িয়ে ?) সমস্ত মুখটার উপর প্রভুত্ব করছে। অরাজকতা করছে। 'নিরঞ্জনের আর-কিছু না থাক, একখানা নাক আছে।' —সুনীলের এটা একটা প্রিয় রসিকতা। রসিকতা—

অন্তত ও তা-ই মনে করে। নইলে কি আর লেশমাত্র সুযোগ পেলেই বলে ; এবং chuckle করে? আসলে কিন্তু নিরঞ্জনের নাক ছাড়া আরো অনেক-কিছু আছে। যেমন, দু'হাতে দশটা আঙুল। লম্বা সরু, শাদা আঙুল ; ঝকঝকে, লালচে নখ—মোটের ওপর, আশ্চর্য। এমন আঙুল, যাতে কেউ কোনোদিন এতটুকু ময়লাও দেখেনি, ছুঁতে যা সব সময় শুকনো—শুকনো আর নরম। এমন আঙুল, যাদের আলাদা প্রাণ আছে ব'লে মনে হয় ; সব সময় ওরা অস্থির, সব সময় ছটফট করছে, নড়াচড়া করছে, পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে ; নিরঞ্জন রায়ের চুল নিয়ে, রুমাল নিয়ে, পাঞ্জাবির বোতাম নিয়ে হুলুস্থূল বাধাচ্ছে। মেজাজ ভালো থাকলে নিরঞ্জন দয়া ক'রে নিজের সম্বন্ধে এটুকু স্বীকার করে যে সে একটু ন্যর্ভস। 'একটু!'—সুকুমার বলে—একটার জায়গায় তিনটে অ্যাডমিরেশন-চিহ্ন উচ্চারণ ক'রে বলে। যার মানে বুঝতে না-পেরে থাকলে আপনার উচিত—নিরঞ্জন যখন ওর কোনো কনভিকশন নিয়ে তর্ক করে, বা নিজের কোনো থিওরি বোঝায় (এবং পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে ওর অনেক কনভিকশন এবং ততোধিক থিওরি আছে)—আপনার উচিত তখন ওকে দেখা। তাহ'লে আপনি বুঝতে পারবেন, সুকুমারের তিনটে অ্যাডমিরেশন-চিহ্ন

উচ্চারণ করবার মানে কী। দেখবেন, নিরঞ্জনের ফর্শা মুখ গেছে টকটকে লাল হ'য়ে; ওর চোখে এসেছে তাড়া-খাওয়া হরিণের মতো তীব্র ব্যাকুলতা; আর ওর মুখে কথার খই ফুটছে একেবারে; গড় গড় ক'রে অনর্গল ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে কথা—একটা মাঝ-পথে থাকতেই আর একটা; আবার সেটা খালাশ না-পেতেই আরো এক মুঠো। কথাগুলো পরস্পরের উপর লাফিয়ে পড়ছে, পরস্পরকে হত্যা করছে। ফলে, ও কী বলতে চায় তা কেউ বুঝতে পারে না; কতগুলো শব্দের তোল-পাড় শুনতে পায়, কিন্তু তা থেকে কোনো সুস্পষ্ট, অর্থপূর্ণ কথার সমাবেশ বা'র করতে পারে না। আর দেখবেন, সেই সময়ে ওর আশ্চর্য আঙুলগুলোর আশ্চর্য ব্যবহার—ওর চুলগুলোকে নিয়ে এমন টানা-হেঁচড়া করে যে—ভাগ্যিশ ওর চুলগুলো ভীষণ শক্ত! ওর পাঞ্জাবিটাকে যেখানে-সেখানে মুঠো ক'রে ধরে, নির্দয়ভাবে মোচড়ায়। ফলে, হতভাগ্য পাঞ্জাবির এমন চেহারা হয় যে তা প'রে থাকতে হ'লে অতনু মিত্র আত্মহত্যা করতো, মর্মাহত হ'তো অনেকেই। এমনি খানিকক্ষণ ও নিজের সঙ্গে এবং বিপক্ষের সঙ্গে (যদি কেউ থাকে) যুদ্ধ ক'রে যাবে—কুড়ি মিমিট, কি বড়ো জোর আধ ঘণ্টা। তারপর ক্লান্তিতে—নিছক শারীরিক ক্লান্তিতে (জানেন তো, ডাক্তাররা

একবার ওর মধ্যে টি. বি. সন্দেহ করেছিলেন) ও হঠাৎ ব'সে পড়বে। বলা বাহুল্য, এতক্ষণ ও ব'সে ছিলো না। মাঝে-মাঝে অবশ্য ব'সেও ছিলো ; কিন্তু তেমনি আবার দাঁড়িয়েও ছিলো, পাইচারিও করেছিলো—একসঙ্গে দু' মিনিট একভাবে ছিলোনা। চড়কি-বাজির মতো ছটফট করতে-করতে ও কথা ব'লে যাচ্ছে, ওর চোখের দৃষ্টি ব্যাকুল থেকে ব্যাকুলতর হচ্ছে, ওর গলার স্বর ক্রমেই চড়ছে। শেষটায়, গলা যখন যদ্দূর সম্ভব চড়ানো হয়েছে, তখন—আরো চড়াতে গিয়ে গলা যাবে ভেঙে, তখন হঠাৎ ও ব'সে পড়বে ; ব'সে হাঁপাবে। এতক্ষণ, বিপক্ষ (যদি কেউ থাকে) স্তম্ভিত হ'য়ে ওকে দেখছিলো—দেখছিলো, আর তর্ক করার সমস্ত স্পৃহা তার মন থেকে চ'লে যাচ্ছিলো। এখন ওকে দেখে আবার তার মনে স্পৃহা হবে—তর্ক করবার নয়, ওর মাথায় হাওয়া করবার, ওর কপালে হাত বুলিয়ে দেবার। কারণ, এখন ওকে দেখলে আপনার করুণা হবে—আপনার, আমার, এবং সকলের। এখন নিরঞ্জন বুঝতে পারছে, ও নিজেকে কতটা হাস্যাস্পদ করেছে! শারীরিক অবসাদটাও দারুণ লজ্জার সঙ্গে ওকে স্বীকার করতে হচ্ছে—না-ক'রে উপায় নেই। নিজের ক্ষমতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে নিজের অক্ষমতারই

ও সংশয়াতীত প্রমাণ দিয়েছে। আপনি যদি এখন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, তাহ'লে মনে-মনে ও খুশি তো হয়ই, মুখেও কোনো আপত্তি করে না। কারণ, এখন আর ওর মনে পৌরুষের অহংকার নেই ; আত্ম-অপমানের চূড়ান্ত বিনয় ওকে দিয়ে বলিয়ে ছাড়ছে—তুমি অক্ষম, তুমি অক্ষম। এখন ও প্রতিজ্ঞা করছে, আর কখনো এই রকম বোকার মতো যুদ্ধ করবে না। আর কী নিয়ে যুদ্ধ? কিছুই না! কিন্তু নিরঞ্জন রায় যদি তার এ-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতো, তাহ'লে তাকে নিয়ে কোনো গল্প লেখা হ'তে পারতো না ; কারণ—যতই আমরা বস্তুতন্ত্রের বড়াই করি না কেন, অসাধারণ মানুষকে নিয়েই গল্প হয় ; আর অসাধারণ লোকরা চিরকাল কিছু-না নিয়েই যুদ্ধ ক'রে এসেছে—যেমন প্রেম, যেমন সম্মান, যেমন স্বাধীনতা। তাই, কালই নিরঞ্জন রায় আবার জ্ব'লে উঠবে, গায়ের জামা মোচড়াবে, তারপর ব'সে হাঁপাবে। আবার অনুতাপ করবে। অসম্ভব উত্তেজনা ওর মনে, অসম্ভব ওর উত্তেজিত হবার ক্ষমতা। এবং উত্তেজিত অবস্থায় ওর কথা ভেবেই তো সুকুমার তিনটে অ্যাড-মিরেশন চিহ্নই উচ্চারণ করতে বাধ্য হয় ; আর বজ্রধর বলে, 'নিরঞ্জন দৈবাৎ মধ্যযুগ থেকে ছিটকে এসেছে ; বিংশ শতাব্দীতে ও anachronism।' 'নিরঞ্জন হচ্ছে মধ্যযুগের

নাইট্'—বজ্রধর বলে—'ওর মধ্যে প্রচুর দাক্ষিণ্যের সঙ্গে দুর্জয় সাহস মিলেছে—পুরোনো দিনে যা'র নাম ছিল শিভ্যলরি। ওকে ডন্ কুইক্সট্ ব'লে ঠাট্টা করা সোজা। ঠিকই, অনেক সময় ও হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে। কিন্তু, কিসের সঙ্গে যুদ্ধ করছি—তার চাইতে, কী-জন্য যুদ্ধ করছি, এ-কথাই গুরুতর। নিরঞ্জন অবশ্য জানে না, ও কী জন্য যুদ্ধ করছে—বিংশ শতাব্দী ব'লেই জানে না। বিংশ শতাব্দী প্রতিদিন নতুন-নতুন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা করছে, কিন্তু এত কম কাল্পনিক উদ্ভাবনা পৃথিবীর অন্য-কোনো যুগে হয়নি। তিনশো বছর আগে হ'লেও নিরঞ্জন জানতো, ও যার জন্য যুদ্ধ করছে, তার নাম ঈশ্বর, ও যা খুঁজছে, তার নাম প্রেম। কিন্তু বিংশ শতাব্দী ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছে, প্রেমকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তাই আজকালকার দিনে শিভ্যলরি নেই, মহত্ব নেই ;—তার মানে, ক্ষমতার সঙ্গে মমতা নেই, আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে আত্ম-ত্যাগ আজকাল কালে-ভদ্রে দু'একজন জন্মায়, যাদের রক্তে মহত্ব বইছে ; নিরঞ্জন তাদের একজন—এবং, আমি যত লোককে চিনি, তাদের মধ্যে নিরঞ্জন একমাত্র। তাই—ওকে তোমরা যত খুশি ঠাট্টা করতে পারো, সময়-সময় করুণা করতে পারো—কিন্তু ওকে অশ্রদ্ধা করবার উপায় নেই। তাই—কথা বলতে-বলতে ওর যখন মুখ

লাল হ'য়ে ওঠে, ক্লান্তিতে ও যখন মুহ্যমান হ'য়ে পড়ে, তখন ওকে দেখে তোমাদের দুঃখও হয়, হাসিও পায়— কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয়, ওর এই উত্তেজনা দুর্লভ, ওর নিজেকে হাস্যাস্পদ করার এই ক্ষমতা ওর মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান জিনিশ, সব চেয়ে গৌরবের। হঠাৎ ও তোমাদের সবাকার চাইতে অনেক বড়ো হ'য়ে যায়; ওর করুণ দুর্বলতার মধ্যে দুর্জয় সাহস দেখতে পাও, দুর্জয় সাহসের সঙ্গে অবারিত দাক্ষিণ্য।'

আর বজ্রধরের এই-সব কথা শুনলে শর্বরী হয়তো ব'লতো: 'ঠিকই; একদিনের কথা অন্তত বলতে পারি, যেদিন ও হঠাৎ আমার চেয়ে অনেক বড়ো হ'য়ে গিয়েছিলে; যেদিন, পালা-বদল ক'রে ও আমার কাছে মা-র মতো হয়েছিলো, আর আমি ওর কাছে শিশুর মতো হয়েছিলাম। যে-সন্ধ্যায় তুমি আমাদের বাগান থেকে বেরিয়ে গেলে, বজ্রধর, আর ফিরে এলে না। যে-সন্ধ্যায় আকাশে সাত তারা ফুটেছিলো।'

২

ও যে মধ্যযুগের একজন যোদ্ধা ও মিস্টিক—ভুল ক'রে বিংশ শতাব্দীতে এসে জন্মেছে, নিরঞ্জন নিজে অবশ্য তা জানে না। কিন্তু ও কী নয়, তা ও জানে। ও বর্নার্ড শ'র মতো নাট্যকার নয় ;—মানে, এখনো নয়। একদিন হবে হয়তো। নিজের মধ্যে সে-প্রতিভা ও অনুভব করছে। একদিন বাংলাদেশে তুমুল ঝড় উঠবে—নিরঞ্জন রায়ের প্রথম নাটক যেদিন বেরুবে। বেরুবে, কারণ কলকাতার কোনো থিয়েটর ওর নাটক নেবে না—সে জানা কথা। কেননা, ওতে না থাকবে স্বদেশিকতা, না বনদেবীর নৃত্য, না ভিক্ষুকের ধর্ম-সংগীত, না রূপকের ধোঁয়া। কাজেই, প্রথমে বই ক'রে বা'র করা ছাড়া উপায় নেই—নিজের খরচেও যদি হ'তে হয়, বেশ, তা-ই। দেশের লোককে একবার অভিভূত ক'রে দিতে পারলে থিয়েটর আপনা থেকেই গ'ড়ে উঠবে। অন্তত, নিরঞ্জন তা-ই আশা করে। আর যদি তা না-ও হয়, তবু হতাশ হবার কারণ নেই। একটু অপেক্ষা করতে হবে—এইযা। ওর প্রভাবে নিশ্চয়ই আরো অনেক নতুন নাট্যপ্রতিভা দেখা দেবে ; এবং কয়েকজন নাট্যকার মিলে একটা থিয়েটর আরম্ভ করা কিছুই কঠিন নয়। ডবলিনের অ্যাবি

থিয়েটরের মতো। গোড়ায়, যেমন-তেমন ক'রে চলবে। নিজেদের ভিতর থেকেই অভিনেতা-নেত্রী সংগ্রহ করতে হবে—কিছুদিন পর্যন্ত বিনি-পয়সায় বা সামান্য মূল্য নিয়ে যারা খাটবে। হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে অতনু আর সুকুমারকে (হতভাগারা লিখতে যখন পারে না, অভিনয় করতে পারবে নিশ্চয়ই; সময়বিশেষে নিরঞ্জনের ধারণা হয় যে বিধাতা পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক পাঠিয়েছেন—নাট্যকার আর অভিনেতা); মেয়েদের মধ্যে শর্বরী—হ্যাঁ শর্বরী তো বটেই, আর অমিতা, আর উমা—উমার মাথায় যদি স্বাদেশিকতার খেয়াল না চাপতো!

যখনই নিরঞ্জন নাটকের কথা ভাবতে আরম্ভ করে, ঠিক এই জায়গায় এসে হোঁচট খায়—সাংঘাতিক হোঁচট। অমনি মনে হয়, ওর একটুও শক্তি নেই, ও একেবারে অক্ষম, কোনো কালেও ও বর্নার্ড শ-র মতো নাটক লিখবে না, কলকাতায় কোণোকালেও অ্যাবি থিয়েটর গ'ড়ে উঠবে না, সমস্ত দেশ উচ্ছন্নে যাবে, বছর কয়েক পরে ও যক্ষ্মায় মরবে। একবার তো টি. বি. ঢুকেছিলো, এখন অবশ্য বেশ আছে—কিন্তু আবার হ'তে কতক্ষণ! নিশ্চিন্ত দীর্ঘায়ু যার হাতে নেই, র'য়ে-সয়ে কাজ করা কি তাকে মানায়? যা করবার, এক্ষুনি। কিন্তু—উমার কথা মনে

করলেই তার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে—আবার আগুনের মতো তেতে ওঠে। উমা—সোনার মতো যার গায়ের রং, মেঘের মতো যার চুল, কণ্ঠস্বরে যার নদীর মতো আবেগ—সেই মেয়ে কিনা চটের মতো মোটা, জঘন্য সব রঙের খদ্দর পরে, সেই মেয়ে কিনা মদের দোকানে, ছেলেদের কলেজে পিকেটিং করে, মির্জাপুর স্কোয়ারে বক্তৃতা দেয়! ফুলের মতো নরম যার আঙুল, সে-মেয়ে কিনা চরকায় সুতো কাটে! যে-মেয়ে চোখে কাজল পরলে আকাশ থেকে তারা খ'সে পড়ে, সে কিনা রান্নাঘরের উনুনে সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরি করে! ভাবলে, নিরঞ্জনের চীৎকার ক'রে কাঁদতে ইচ্ছা করে। দেশের কথা সে কিছু বোঝে না, সত্যি বোঝে না—খবরের কাগজগুলো এত বড়ো যে তার হাতে এলেই কেমন এলোমেলো হ'য়ে যায়; গুছোতে গেলে প'ড়ে যায় হাত থেকে। এই কারণে, খবরের কাগজ সে কোনো-কালেও পড়তে পারেনি। কেন যে সমস্ত দেশ চ্যাঁচামেচি মারামারি ক'রে মরছে, তা ওর মাথায় ঢোকে না—'যেন অন্য যে-কোনো দেশের মতো আমরাও সুখে নেই!' একটা দেশ কী ক'রে শাসিত হয়, একটা দেশ কী ক'রে সমৃদ্ধ হ'তে পারে, চিত্তরঞ্জন দাশ কেন ব্যারিস্টারিতে ক্লান্ত হ'য়ে কবিতা না-লিখে জেলে গেলেন—এ-সব কথা

কোনোকালেও সে ভাবে না, এ-সব কথা সে কিছু বোঝেনা। যা বোঝে, তা হচ্ছে এই যে, উমার পক্ষে খদ্দর পরা অশ্লীল; বোঝে, মদের দোকানের সামনে হত্যে দিয়ে প'ড়ে থাকা উমার কর্তব্য নয়; উমার অবসর চরকায় কাটানো যায় না; বোঝে, ইংরেজের আইন ভাঙতে গিয়ে উমা ঈশ্বরের আইন ভাঙছে—মানে, নিজেকে ভাঙছে—মানে, ইংরেজের আনই-ভাঙা ওর জীবনের আইন নয়। জীবনের স্বাভাবিক উন্মুখতাগুলিকে সে জোর ক'রে ধ'রে-বেঁধে উল্টো পথে নিয়ে যাচ্ছে; জীবনকে এড়িয়ে এগোচ্ছে মৃত্যুর দিকে। কেননা, মানুষ যখন নিজের ইচ্ছায় বাঁচে না, অন্যের তৈরি কতগুলো নিয়ম-অনুসারে (সাধুভাষায় যাকে বলা হয় 'লক্ষ্য', 'আদর্শ', 'ব্রত'—ইত্যাদি) চলাফেরা করে—তারই নাম কি মৃত্যু নয়? যে-সব মেয়েরা দেখতে বিশ্রী, যারা কথা বলতে পারে না, যাদের মধ্যে কোনো মোহ নেই, তারা পিকেটিং করলেই তো পারে—যদি পিকেটিং এমন জিনিশই হয়, যা না-করলে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ভারতবর্ষ মুছে যাবে। সকাল থেকে সন্ধে যারা হাঁড়ি ঠেলছে, তারা সন্ধেয় হাঁড়ি ঠেলে সকালে না-হয় চরকা ঘোরাক—কেউ আপত্তি করবে না। কারণে-অকারণে কলহ ক'রে যারা বাকনিপুণ হয়েছে, তাদের ধ'রে এনে না-হয় মির্জাপুর স্কোয়ারে

বক্তৃতা দেয়ানো হোক—তাতে দেশের একটা যে উপকার হবে, তা নিশ্চিত। কিন্তু উমা—নিরঞ্জনের চীৎকার ক'রে কাঁদতে ইচ্ছা করে।

অথচ, উমা চিরকালই কিছু এই রকম ছিলো না। প্রথম যখন নিরঞ্জনের সঙ্গে ওর আলাপ হয়, তখন ও বেশ স্বাভাবিক, সুস্থ, পরিপূর্ণ মানুষই ছিলো—ওতে একটুও ভেজাল ছিলো না। তখন ওর উৎসাহ ছিলো সাহিত্য, ওর আর্ট ছিলো কথোপকথন, ওর বাতিক ছিলো নিজেদের বাড়িতে ছোটো ছোটো নাটকের অভিনয় করা—যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ডাক্‌ঘর', 'গৃহ-প্রবেশ', ইত্যাদি। কিন্তু ভারি ছোটো 'ইত্যাদি',—আসলে মিথ্যে 'ইত্যাদি'; কেননা, দু'চারটে নাম করার পর মাথায় হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল্ খুঁজলেও আর নাম পাবো না, সুতরাং নিজের মনকে এবং বাইরের লোককে বুঝ দেবার জন্য আলগোছে একটা 'ইত্যাদি' বসিয়ে দিলাম; চুপে-চুপে, চোরের মতো; কেননা, এই 'ইত্যাদি'র যে কোনো মানে নেই, তার যে অপপ্রয়োগ হয়েছে, তা আমরা জানি। উমাও তা জানতো, এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করতো। এবং—খুব সম্ভব—ও নিজেও এ-সময়ে নাটক লেখ্‌বার চেষ্টা করতো। অন্তত, হিমাংশু তা-ই বলেছিলো নিরঞ্জনকে। হিমাংশু ছিলো নিরঞ্জনের

বন্ধু, নিরঞ্জনের ব্রিলিয়ন্ট বন্ধু। চেহারায়, কথাবার্তায়, পরীক্ষায় ব্রিলিয়ন্ট। এই হিমাংশুই ওকে প্রথম উমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। বলে, 'উমার জন্যে ছোটো-ছোটো নাটক লিখে তুমি হাত পাকাতে পারো, নিরঞ্জন; এ-সব বিষয়ে ওর আশ্চর্য flair। আমাদের দেশে যা সবচেয়ে বিরল, তা-ই ওর আছে—ideas। তোমার যে-নাটকগুলো এখনো লেখা হয়নি, তাদের একটা সমবেত উৎসর্গ এখনি লিখে রাখতে পারো—উমা চ্যাটার্জিকে। কেননা, তাদের অভিনয়ের জন্য তুমি বাংলা দেশে একজন লোকের উপরই নির্ভর করতে পারো—সে উমা চ্যাটার্জি।'

নাটক অবশ্য নিরঞ্জন তখনও লেখে নি; লেখবার জন্যে তৈরি হচ্ছে মাত্র—মানে, রাজ্যের যত নাটক প'ড়ে শেষ করছে—লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে-দিয়ে পড়ছে। কেননা, ও সংকল্প করেছে যে ওর কোনো কাঁচা লেখা কেউ কোনোদিন পড়্বে না; প্রথমে যা নিয়ে ও বেরুবে, তা-ই নিখুঁত, অনিন্দ্য, অপূর্ব। ওর পাঠকরা 'Widowers' Houses' বা 'Mrs Warren's Profession' প'ড়ে আমতা-আমতা করবার অবসর পাবে না; একেবারেই Candida' বা 'You Never Can Tell'—যা তাদের অভিভূত, সম্মোহিত, বিমূঢ় ক'রে দেবে। ওর তাড়া

নেই ; শ-ও ছত্রিশ বছর বয়সে প্রথম নাটক লেখেন। কিন্তু এদিকে যে ওর ফুসফুসে—!

চুলোয় যাক ফুসফুস। নিরঞ্জন তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্রতিভার বাজে খরচ করবে না। ওর সবুর সয়। তাই দিনের পর দিন, প্রতি সন্ধ্যায় চললো ওদের আলোচনা—ওদের তিনজনের। উমা আর নিরঞ্জন আর নিরঞ্জনের ব্রিলিয়ণ্ট বন্ধু, হিমাংশু। সেই সন্ধ্যাগুলো নিরঞ্জনকে নাটক-বিষয়ে এত শিখিয়ে দিয়ে গেলো যে আর-একটু হ'লেই ও লিখতে আরম্ভ করে! তৈরি ও হ'য়ে আসছিলো এতদিনে। কিন্তু হঠাৎ—বলা নেই, কওয়া নেই—হিমাংশু আই. সি. এস. পরীক্ষা পাশ ক'রে বিলেত চ'লে গেলো—আর উমা হ'লো স্বদেশি : ঘোর স্বদেশি। একদা গান্ধিজির খেয়াল হ'লো অনেক লোকজন নিয়ে আরব সমুদ্রের তীর ধরে খানিক হাঁটবেন ; তারই ফলে : নিরঞ্জন তো অবাক! তারই ফলে ভারতবর্ষের সব খেজুর গাছ কেটে ফেলা হ'তে লাগলো, গাছ মাথায় প'ড়ে একজন লোক বিঘোরে প্রাণ দিলো, শিশুরা মায়ের পেট থেকে খদ্দর প'রে বেরুতে লাগলো—আর উমা, উমা চ্যাটার্জি হঠাৎ উমা দেবী হ'য়ে গেলো—কাগজে যার ছবি বেরোয়, কাজের চাপে যে ঘুমোবার সময় পায় না।···নিরঞ্জন অবাক।

এক-এক সময় নিরঞ্জনের মনে হয়, উমার উপর এতটা নির্ভর করা তার উচিত হয়নি। উমা ওর একটা অভ্যেস হ'য়ে গেছে, কোনো মানুষের জীবনে অন্য-কোনো মানুষ যা হ'লে, নানারকম সব গোলমাল বাধে, এবং যা এড়াবার জন্যে এই প্রকাণ্ড মিথ্যার উদ্ভাবনা; 'Familiarity breeds contempt'। উমাকে বাদ দিয়ে ও নিজেকে ভাবতে পারে না; উমা ওর যে-নাটকে না নামবে, তা ও কী ক'রে লিখবে?—কারণ, অভ্যেসের এমনি জোর যে ও এ-অবধি যত নাটক ভেবেছে, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে উমার মতো একটি মেয়ে আছে—উমার অভিনয় করবার মতো পার্ট। নিরঞ্জন এখনো এ-অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারেনি, যদিও উমা ওকে মুখের উপর ব'লে দিয়েছে যে 'দেশের বর্তমান অবস্থায়' নাটক ফাটক সব স্বচ্ছন্দে গোল্লায় যেতে পারে—কিছুই এসে যায় না। কিন্তু সহজেই যে-জিনিশ কাটিয়ে ওঠা যায়, তার নাম আর অভ্যেস হবে কেন? বলতেই বলে—অভ্যেস। তবু, নিরঞ্জন চেষ্টা করে। পুরুষের মতো, বীরের মতো চেষ্টা করে। যে-চিন্তা ওর মন আচ্ছন্ন ক'রে আছে, তা দূর করবার জন্য প্রবল মাথা-ঝাঁকুনি দেয়। এটা ওর একটা মুদ্রাদোষ; অনেক ভেবেও যার কূল-কিনারা করা যায় না, তাকে প্রবল মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে তাড়াতে চায়;

কেননা, সব চিন্তা তো মাথার মধ্যেই থাকে, এবং—হ'তে পারে—ঝাঁকুনির বেগ সইতে না-পেরে চিন্তাগুলো অচেতন হ'য়ে পড়বে; নিদেন, এলোমেলো হবেই। তাই, প্রবল মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে উমাকে ও দূর ক'রে দেয়; দিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে ব্যারি পড়তে বসে। বহুবার পড়া বই—কোথায় কী আছে, সব তার মুখস্থ: তাই একটা রসিকতার কাছাকাছি এসেই সেটা মনে ক'রে তার হাসি পেতে থাকে; হাসতে-হাসতে সে নিজেকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করে যে তার মতো সুখী পৃথিবীতে বিরল। সে সুখী; কারণ সে এমন-সব নাটক লিখবে, যা 'age cannot wither nor custom stale'। হঠাৎ তার মনটা সূর্যের আলোর মতো উজ্জ্বল স্পষ্টতায় ফুটে ওটে; নিজেকে সে পরিষ্কার বুঝতে পারে। মাঝখানে একটা আঙুল রেখে বইখানা ভেজিয়ে সে মনে-মনে বলে: 'আসল ব্যাপার যে কী, তা আমি জানি, নিরঞ্জন; আমাকে ফাঁকি দিতে পারছো না তুমি। মুখে তুমি যা-ই বলো না, আসলে—উমা তোমার সঙ্গিনী হ'লো না, এ-ই তোমার দুঃখ। তা-ই নয়? কথাটা আরো সহজ ক'রে বলা যায়: উমা তোমাকে ভালোবাসে না। বড়ো বেশি সহজ হ'য়ে গেলো,—সুতরাং একটু জটিল করা যাক। উমা তোমাকে ভালোবাসে কিনা, তা তুমি বুঝতে পারো

না। তাই তোমার এই ছট্‌ফটানি, যার জন্য তুমি লিখতে পারছো না; অন্তত পারছো না ব'লে বলো। কিন্তু শেক্সপিয়রের কি কোনো স্ত্রী ছিলো? মানে, সে-রকম স্ত্রী, যার প্রেরণায়—ইত্যাদি। প্রেম, প্রেরণা, প্রতিভা—মন ভুলোনো, ছেলে-ভুলোনো সব কথা; আসল কথা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, লেগে থাকার শক্তি। তা যদি তোমার থাকতো, তাহ'লে এতদিনে তুমি লিখতেই, উমার মুখ চেয়ে ব'সে থাকতে না। না-লিখে পারতে না তুমি। উমাকে সঙ্গিনীরূপে পেলে না বলে মন-খারাপ ক'রে ব'সে থাকতে না। আমার সন্দেহ হচ্ছে, নিরঞ্জন, তোমার মধ্যে যে-জিনিষই নেই, যা থেকে—ইত্যাদি। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে উমাকে হাজারবার বিয়ে করতে পারলেও তুমি কোনোদিন নাটক লিখবে না। লোকে ঠিকই বলে, নিরঞ্জন; তুমি একেবারে অপদার্থ, অকর্মণ্য; তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। প্রমাণ: উমাকে জয় করতে (জয় করতে—ইংরিজি কথার বাংলা তর্জমা করলে কী মজার শোনায়!) উমাকে জয় করতেই তুমি পারলে না, যা কিনা বর্নার্ড শ-র মতো নাটক লেখার চাইতে অনেক সোজা কাজ।'

কিন্তু এখানে নিরঞ্জনের ভিতর থেকে তীব্র প্রতিবাদের স্বর বেজে ওঠে। 'উমাকে জয় করতে পারি

আর না-ই পারি, বর্নার্ড্ শ-র মতো নাটক আমি লিখ্বোই—তুমি দেখো। বড়ো বেশি দেরিও নেই তার।'

তারপর আত্ম-প্রতিষ্ঠার ছট্ফটানি ওকে দিয়ে বলিয়ে ছাড়ে, 'ভারি তো উমা!'

'আমার বর্তমান অবস্থায় উমা-টুমা সব স্বচ্ছন্দে গোল্লায় যেতে পারে—কিছুই এসে যায় না।' উমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে নিজের মনে ও বলে।

হঠাৎ উমার উপর ও ভীষণ চ'টে যায়। উমা ওকে পেয়ে বসেছে: ঘাড় থেকে এ-ভূত নামাতে না-পারলে ওর কোনো আশা নেই। সঙ্গে-সঙ্গে হিমাংশুর উপরও রাগ হয়; কেননা, হিমাংশুই তো ওর মাথায় ঢুকিয়েছিলো যে ওর সবগুলো নাটকের একটা সমবেত উৎসর্গ—উৎসর্গই বটে! হিমাংশুকে পেলে ও এখন মনের ঝাল মিটিয়ে নিতে পারতো, কিন্তু ও-হতভাগাও তো বিলেত গিয়ে পার পেয়েছে। উমা চ্যাটার্জি! দেশোদ্ধার করছেন তিনি। করুন! ব'য়ে গেছে ওর। ব'য়ে গেছে ওর, উমা চ্যাটার্জি—না, চ্যাটার্জি তো নয়, দেবী—উমা দেবী যদি ওর নাটক সম্বন্ধে উদাসীনই থাকে। সকলিং-সাহেব লাখ কথার এক কথা ব'লে গেছেন: 'The Devil take her!'

এই রকম উত্তেজনা নিরঞ্জনের প্রায়ই হয়। এবং উত্তেজনা টাটকা থাকতে-থাকতে ও অনেক দিন টেবিলে গিয়ে বসেছে। লেখবার জন্য। নাটক। লেখবার সরঞ্জাম সব তৈরি—সর্বদাই তৈরি থাকে। শর্বরী সে-বিষয়ে কড়া নজর রাখে। যদ্দূর সম্ভব সরু মুখের একটি ফাউণ্টেন পেন সর্বদা কালি-ভরা থাকে—নিরঞ্জন মোটা কলম সহ্য করতে পারে না। (এবং নিরঞ্জন এত জোর দিয়ে লেখে যে মাসখানেকের মধ্যেই কলম মোটা হ'য়ে যায়—মানে, তেমন-কিছু মোটা হয় না, কিন্তু নিরঞ্জনের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট, নিরঞ্জনের পক্ষে তা-ই অব্যবহার্য। শর্বরীকে তাই একসঙ্গে অনেকগুলো কলম কিনে রাখতে হয়—প্রতি মাসের পয়লা তারিখে ওর এক কর্তব্য, দাদার টেবিল থেকে পুরোনো কলম তুলে নিয়ে নতুনটি রেখে যাওয়া। কলমগুলো অবশ্য অবিকল একরকম, তাই নিরঞ্জন অনেক সময় টেরও পায় না।) কলম—আর কাগজ; নাটক লেখবার জন্য খসখসে, কড়কড়ে ঈষৎ-নীল ব্যাঙ্ক-পেপার; চিঠি লেখবার জন্য খসখসে, ধবধবে শাদা মোটা পার্চমেণ্ট—বোহেমিয়ায় তৈরি, বা হয়-তো অসলোয়। কাগজের ব্যাপারে নিরঞ্জন ভয়ানক খুঁতখুঁতে কিনা—তাই শর্বরীকে অনেক খুঁজে'-পেতে এ-সব জোগাড় করতে হয়—অসম্ভব দামে। কিন্তু এত করেও নিরঞ্জন

বাংলা অক্ষরগুলোকে বাগে আনতে পারলোনা ; কারণ, আপনাদের জানা উচিত যে ওর হাতের লেখা খারাপ, অত্যন্ত খারাপ, দুর্বোধ্য, দুঃসাধ্য হাতের লেখা, অস্বাভাবিক, অসম্ভব হাতের লেখা। অবশ্য চেষ্টা করলে যে পড়া না যায়, তা নয় ; কিন্তু দেখতে এত বিশ্রী যে চেষ্টা করতেই আপনার ইচ্ছে করবে না। অমন বিশ্রী চেহারা ক'রে যে পড়বার মতো কোনো জিনিশ লেখা যেতে পারে, তা মনেই হ'বে না আপনার। মানুষের হাতের লেখা ভালোও হয়, মন্দও হয়—কিন্তু কী ক'রে যে তা এতদূর খারাপ হ'তে পারে, তা নিয়ে সুকুমার সেন আর অমিতা চন্দ অনেকদিন গবেষণা করেছে। পরে—ওদের সব গবেষণার ফল যা হয়, তা-ই হয়েছে—ওরা দু'জনে হেসে উঠেছে একসঙ্গে। ওরা দু'জন প্রায়ই একসঙ্গে হাসে, ওরা দু'জন বড়ো বেশি হাসে। তা হাসুক। ওরা হাসে ব'লেই যে নিরঞ্জন আর লিখবে না, তা তো আর নয়। ও লিখবেই। উমার উপর রাগ ক'রে ও নাটক লিখতে বসবেই। কলম হাতে নিয়ে ও খানিকক্ষণ ভাববে। প্রথম সমস্যা : পাত্রপাত্রীদের নাম। সমস্যা বটে। যত ভাববে, কিছুতেই কোনো পছন্দসই নাম মনে আসবে না। তারপর খুঁজতে-খুঁজতে হঠাৎ একটি নাম মনে পড়বে : উমা। উমা। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়বে

সোনার মতো গায়ের রং, মেঘের মতো চুল। আর, হঠাৎ তার মন থেকে সব রাগ চ'লে যাবে, তার জায়গায় আসবে মাধুর্য, এমন মাধুর্য, যা শুধু সোনার মতো গায়ের রং আর মেঘের মতো চুল মনে করলেই পুরুষের মনে আসে। তাই সে ব্যাঙ্ক-পেপার সরিয়ে রেখে ধবধবে শাদা মোটা পার্চমেন্ট নিয়ে চিঠি লিখতে বসবে। লিখবেও। উমাকে। চিঠি লিখবে, কারণ তখন তার যে-সব কথা মনে হবে তা মুখে উমাকে বলতে গেলে সে এমন উত্তেজিত হ'য়ে পড়বে যে উমা নিছক করুণায় তার সব কথায় সায় দেবে—সব কথা না-বুঝে থাকলেও। তাই সে চিঠি লিখবে, যদিও সে জানে যে তার হাতের লেখা দেখলেই আর পড়তে ইচ্ছা করে না, তবু। সে জানে যে পরে দেখা হ'লে উমা চিঠি লেখার জন্য তাকে ঠাট্টা করবে, কিন্তু তবু সে লিখবে। যেমন আজ সকালে লিখছে। এ-রকম চিঠি সে ঢের লিখেছে, কিন্তু উমা যে তার চিঠিগুলো পড়ে (বা পড়তে পেরেছে), তার কোনো প্রমাণ সে এ-পর্যন্ত পায়নি ; তবু আজ সকালে সে আবার লিখতে বসেছে। কাগজের উপর প্রায় মাথা ঠেকিয়ে দ্রুতবেগে সে লিখছে—লিখছে তো লিখছেই। একবার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে না, ভাববার জন্যে একটু থামছে না, কোনো কথা বসানোর

আগে ইতস্তত করছে না—পাতার পর পাতা অনায়াসে, অনবরত লিখে যাচ্ছে। লিখবেই—ওর মন যে মাধুর্যে ভ'রে গেছে, যার বৈজ্ঞানিক নাম উত্তেজনা। উত্তেজনা—যে অবস্থায় ওকে কথা বলতে দেখলে করুণা হয়, কারণ কথাগুলো ওর মন থেকে এত তাড়াতাড়ি বেরোয় যে ওর জিভ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে না—যেমন, এখন ওর কলম এত দ্রুতবেগে চ'লেও পাল্লা দিয়ে চলতে পারছেনা। এবং, আপনারা বুঝে থাকবেন যে ও যখনই চিঠি লেখে, উত্তেজনার সময়ই লেখে। এ-থেকে হয়তো এ-ও বোঝা যেতে পারে যে ওর হাতের লেখার খাতাপত্তর যে কোনো কারণই নেই, তা নয়।

'তোমার ধারণা হ'য়ে থাকতে পারে, উমা', (নিরঞ্জন লিখে যাচ্ছে) 'যে তোমার সাহায্য না পেলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে না। হয়তো তা-ই ; এ-সব জিনিশ আমি ভালো বুঝি না। এত কম বুঝি যে বললে সে-কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। তাই, সব সময় আমি চুপ ক'রে থাকি—যেখানে রাজনীতি চর্চা হয় (এবং আজকাল কোথায়ই বা তা না হয় !), সেখানে কখনো যাই না—বরং একা-একা বাড়ি ব'সে থাকি। এক, তোমার বাড়ি ছাড়া। তোমার ওখানে রাজনীতি—মাসিক কাগজে যাকে বলে, "দেশের কথা"—ছাড়া আর-কিছুই চর্চা হয় না আজকাল।

তবু আমি যাই। তোমাকে কখনো একা পাওয়া যায় না; তোমার ঘরে লোক গিশগিশ করছে—দৈনিক কাগজের সহকারী সম্পাদক, অমুক কংগ্রেস-কমিটির সেক্রেটারী, অমুক মহিলা-সমিতির পরিচালিকা, পঁচিশটা নারী-শিক্ষা-মন্দিরের মাষ্টারনি—তা ছাড়া দরজি, ছুতোর, মিস্ত্রি, দপ্তরি—কী নয়? এত লোকের মধ্যে গা ঘিনঘিন করে আমার, এত-সব বাজে কথা আমার কানে ঢোকে যে মনে হয় এ-গুলো ভুলতে-ভুলতে আমার বাকি জন্ম কেটে যাবে, (আসলে, যদিও, রাস্তায় বেরুনোমাত্র সব ভুলে' যাই—ধন্যবাদ ঈশ্বরকে), দু'মিনিটের মধ্যে এত ক্লান্ত হই যে হাত-পা ভারি হ'য়ে আসে। তবু আমি যাই। প্রতিবার প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরুই: আর নয়; এই শেষ। কিন্তু আবার যাই—হয়তো পরদিন বিকেলেই। কেন যে যাই, উমা, তা তুমি জানো। আমিও তোমার মোহে পড়েছি।

'মোহ: কথাটা ভালো করে ভেবে দ্যাখো: মোহ। বাংলা ভাষায় এই একটি শব্দ আছে ব'লে তার সমস্ত দারিদ্র আমি ক্ষমা করতে পারি। মোহ—ইংরিজিতে যার আংশিক তর্জমা হয় মাত্র—charm। মোহ—ঈশ্বর যা সবাইকে দেন না, কিন্তু যাদের দেন, তাদেরকে সবই দেন—তাদের পক্ষে অন্য-কোনো অভাব অভাবই নয়।

আর, যাদের দেন না, তাদের পক্ষে অন্য-কোনো জিনিশই কাজে লাগে না—সৌন্দর্য, যৌবন, বুদ্ধি, সৌজন্য, স্বাস্থ্য, অর্থ—কিছুই নয়; সবগুলো একত্র ক'রেও নয়। তারা কোনোদিন মানুষকে আকর্ষণ করবে না—কারণ, একজনের মধ্যে যে-জিনিশ আর-একজনকে আকর্ষণ করে, তারই নাম charm, মোহ। আলাদা জিনিশ, মোহ। সৌন্দর্য···অর্থ থাকলেই যে তা থাকবে, এমন নয়। সব জিনিশ থেকে আলাদা, মোহ; অথচ সব জিনিশকে সে সার্থক করে; তার আকর্ষণ প্রতিরোধ করা যায় না; তা পুরোনো হয় না, তার ক্ষয় নেই। তার আবেদন সীমাবদ্ধ নয়, সব রকম লোকের উপর তা সমান। মতের, রুচির, স্বভাবের, অবস্থার, বয়সের বৈষম্য—কিছুতেই আসে যায় না। এমনি, মোহ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের অনেকের মধ্যেই তা আছে। কম কি বেশি। যদি না থাকতো, তা হ'লে বন্ধুতা, ভালোবাসা, প্রেম ব'লে কোনো জিনিশ থাকতো না—একজন মানুষের আর-একজনকে ভালো লাগতো না; আমরা সব যে যার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাতাম, পরস্পরের সঙ্গ-কামনা করতাম না। পৃথিবী মরুভূমি হ'য়ে যেতো।

'কিন্তু, উমা, এমন লোকও আমি দেখেছি, যাদের মধ্যে একটুও মোহ নেই। সব বিষয়েই তারা ভালো;

ভেবে দেখতে গেলে, তাদের মধ্যে আপত্তি করার কিছুই নেই, তাদের দিয়ে পৃথিবীর অনেক উপকারও হয়তো হয়েছে কি হবে, কিন্তু—আশ্চর্য!—তাদের সঙ্গে তুমি দশ মিনিটও কাটাতে পারবে না। তাদের সঙ্গে কী নিয়ে কথাবলা যায়, মাথায় হাত দিয়ে ভাববে; তাও বা'র করতে পারবে না। তাদের কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই; কারণ, মোহ তারাও খোঁজে, কিন্তু মোহ যাদের আছে, তারা কেন তাদের নীরসতা সহ্য করতে যাবে? তাদের কথা ভেবে আমার দুঃখ হয়। কী ক'রে যে তারা পৃথিবীতে এসে দীর্ঘ মানব-জীবন কাটায়, তারাই জানে। আমার তো মনে হয়, ও-অবস্থায় আমি দু'দিনেই ম'রে যেতাম। আবার মনে হয়, ম'রে যেতাম-না; কারণ তাহ'লে নিজের নীরসতা সম্বন্ধে আমি সচেতন হতাম না; আমার নির্জীব, বিবর্ণ জীবনকেই স্বাভাবিক মনে করতাম। নয়তো এত সব লোক স্বচ্ছন্দে বেঁচে আছে কী ক'রে? বেঁচে থাক, তারা ভালো। ভালো; ভালো আর মন্দ। কী-সব চমৎকার ভাণ আমরা বা'র করেছি—নিজেদের নিরাপদে বঞ্চনা করবার জন্য। আসলে, কোনো মানুষের সম্বন্ধে ভালো আর মন্দ—এ-দুটো বিশেষণ-প্রয়োগের কোনো অর্থ হয় না; বলতে হয়, তারা সরস না নীরস, তাদের মধ্যে মোহ আছে কি নেই।

'উমা, তুমি এই মোহ দিয়ে তৈরি হয়েছো। তাই তোমাকে কাটিয়ে উঠতে আমি পারছি না। অবশ্য কাটিয়ে উঠতে যে চাই-ই, তা-ও নয়। সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ কখনো তা চায় না। কারণ, সে জানে এই রকম মোহ আছে ব'লেই জীবন মধুর, জীবন বাঁচবার যোগ্য। এবং এই সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ জীবনের উপাসক, মৃত্যুর নয়। জাজ্বল্যমান জীবনের ভয়ে গুহার অন্ধকারে মুখ লুকোয় না সে। জীবনকে গ্রহণ করে, উপভোগ করে। সেই উপভোগের জন্য অনেক জিনিশ তার দরকার; মোহও দরকার—খুব বেশি দরকার। মোহ তার পক্ষে আত্ম-বিস্মৃতি নয়; কারণ, তার নিজের মধ্যেও তা আছে। তাই মোহকে সে ভয় পায় না। সে জানে, নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলবে, এতদূর আচ্ছন্ন সে হবে না; তাই মাঝে-মাঝে আচ্ছন্ন হ'তে সে আপত্তি করে না। আচ্ছন্ন; যেমন, এই মুহূর্তে, উমা, তুমি আমাকে আচ্ছন্ন করছো।

'কিন্তু—জানো, উমা, আচ্ছন্ন করলে নিজেও আচ্ছন্ন হ'তে হয়। এ-ই পৃথিবীর নিয়ম। সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত সাহিত্য তোমাকে এ-ই শিক্ষা দেবে। তোমার মধ্যে যে-মোহ আছে, তার যথেষ্ট ব্যবহার করা তোমার স্বাভাবিক কর্তব্য—নিছক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য।

তুমি শুধু আকর্ষণই করবে, নিজে আকর্ষিত হবে না ; শুধু মোহ-বিস্তারই করবে, নিজে মোহে পড়বে না, এ যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হ'তো, তাহ'লে এতকাল ধ'রে তিনি সৃষ্টিরক্ষা ক'রে আসতে পারতেন না, গাছপালা থেকে মানুষ পর্যন্ত পৃথিবীর মুখ থেকে সব লোপ পেয়ে যেতো। একদিন, দু'দিন, তিনদিন পর্যন্ত আত্মসংবরণ চলে ; কিন্তু আসলে তা আত্ম-বঞ্চনা, তাই চতুর্থ দিনে তা দ্বিগুণ আক্রোশে নিজের উপর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ে—সন্ন্যাসীর কাঠিন্য থেকে স্বৈরীর শৈথিল্য, গোড়ায় যে দুটো জিনিশ এক। কোনোটাই উপভোগ্য নয়। কারণ, দুটোই বাড়াবাড়ি ; একটা দিককে অন্যায়রকম বেশি প্রশ্রয় দেয়া, যার ফলে অন্য সবগুলো দিক শুকিয়ে মরে। আবার, তাদের দাবি মেটাতে গিয়ে অন্য দিককে উপোসি রাখতে হয়। এতে আনন্দ নেই। ঈশ্বরের অভিপ্রায় অস্বীকার করার এই শাস্তি। তার চেয়ে ঠিক সময়ে নিজেকে মোহের হাতে ছেড়ে দেয়াই কি ভালো নয়, উমা ? তাতে স্বাস্থ্য অন্তত ভালো থাকে। তাহ'লে ব্যভিচার থেকে অন্তত মুক্তি পাওয়া যায়। প্রকৃতিকে সাংঘাতিক প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিতে হয় না।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ। সেই পুরোনো কথা। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে এ নিয়ে একটা নাটক লিখেছিলেন। সফোক্লিস

এ নিয়ে একখানা নাটক লিখে গেছেন, যা কেউ পড়ে না, কিন্তু যা নিয়ে সবাই হৈ-চৈ করে। সফোক্লিস-এর ভাষায় প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাবৃত্তির নাম ছিলো নেমেসিস। দয়াহীন, ক্লান্তিহীন এক দেবী, নেমেসিস। মানুষের অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া তাঁর কাজ। চমৎকার; কিন্তু এই ধারণাও নির্ভুল নয়। কেননা, অপরাধ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদলানো দরকার। আমাদের আধুনিক সাহিত্যেও এ-রকম ঢের গলদ আছে ; বিরাজ বেচারার মিছিমিছিই কুষ্ঠ হ'লো, কিরণময়ীকে শেষটায় পাগল হ'তে হ'লো। কিন্তু বাইরে থেকে কোনো দেবী তো আমাদেরকে শাস্তি দেন না ; শাস্তি নিজের ভিতর থেকেই আসে, এবং সেটা অন্ধতা বা কুষ্ঠ বা উন্মত্ততার রূপ নিয়ে আসে না। এক বাড়াবাড়ি থেকে আমাদের আর-এক বাড়াবাড়িতে নিয়ে যায় মাত্র। কেননা, প্রকৃতির পক্ষে একটিমাত্র পাপ আছে ; বাড়াবাড়ি। যে-কোনো রকমের আতিশয্য। মানুষের তৈরি নিয়ম তুমি রক্ষা করছো কি না করছো, প্রকৃতি তা নিয়ে মাথা ঘামায় না ; কিন্তু তোমার বাঁচবার পক্ষে যে-সব নিয়ম তোমার না-মেনে উপায় নেই, জোর ক'রে, নিজেকে কষ্ট দিয়ে, তুমি তার কোনোটাকে যদি লঙ্ঘন ক'রে থাকো, তাহ'লে আর রক্ষে নেই। সেই একটি নিয়মের কাছে পরে তোমাকে

দাসবৃত্তি করতে হবে। সুদে-আসলে পাওনা আদায় ক'রে নেবে। এত বেশি সুদ দিতে হবে যে তুমি নিজে অনেকখানি খরচ হ'য়ে যাবে। হয়তো এত বেশি খরচ হ'য়ে যাবে যে তোমার আর কিছুই বাকি থাকবে না—নিছক শারীরিক মৃত্যুর চেয়ে যে-অবস্থা অনেক খারাপ।

'পুরোনো, এ-সব কথা। আগেকার দিনে তোমার সঙ্গে এ-সব কথা প্রায়ই হ'তো। কিন্তু আজ আবার তোমাকেই তা মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে, কারণ তুমি আজ দেশোদ্ধারে অবতীর্ণ; তার মানে দেশের নামে আত্মহত্যা করছো তুমি। শুনি, আমাদের দেশ নাকি ভারি দুঃখী। যদি তা-ই হয়, আমরা প্রত্যেকে যে যার মতো সুখী হই না কেন?—তাহ'লেই তো দুঃখের ভাগ কমে যায়। কিন্তু তোমাদের রকম-সকম দেখে মনে হয়, আমরা প্রত্যেকে যত বেশি কষ্ট পাবো, যত বেশি না-খেয়ে থাকবো, যত বেশি নোংরা, কুৎসিত, মূর্খ হবো, দেশে ততই আনন্দ উথলে উঠবে। এ-সব বিষয় অবশ্য আমি কিছুই বুঝি না; কিন্তু, তুমিই বলো—দেশ মানে কি মাটি? তোমাকে-আমাকে নিয়েই কি দেশ নয়? যাদের কথা ভেবে মহাত্মার চোখে ঘুম নেই, তারা কি তোমার-আমার মতোই ক্ষুদ্রাত্মা নয়? এই ক্ষুদ্রাত্মাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র

সুখ-দুঃখ কি উপেক্ষণীয় ? খদ্দর দিয়ে তোমার সৌন্দর্যকে হত্যা করবার অধিকার কি তোমার আছে ? উমা, ভালো ক'রে ভেবে ছাখো, যে-সব কাজ (আর কী-সব কাজ !) নিয়ে তুমি আজ মত্ত হয়েছো, তাতেই কি তোমার জীবনের সত্য, তোমার যৌবনের সার্থকতা ? কেন তুমি একটু-একটু ক'রে আত্মহত্যা করছো, বলো তো ? তুমি-আমি যদি সুখী হই, উমা, তাহ'লে এই "দুঃখী" দেশের পক্ষে সেটাই কি কম লাভ ?

"আমি" মানে অবশ্য আমি, নিরঞ্জন রায় নয়। আমাকে ভুল বুঝো না, উমা ; তোমাকে নিজের জন্যে অধিকার করা আমার এ-সব কথার উদ্দেশ্য নয়। তোমাকে যে আমি চাই, তা তুমি জানো ; তা এত কথায় বলার দরকার করে না। কিন্তু আজ অবধি তুমি আমাকে সর্বদা ফিরিয়ে দিয়েছো ; আমার প্রেমকে মুহূর্তের জন্যও স্বীকার করোনি তুমি। এ-জন্য আমি নিজের মনে দুঃখিত হ'তে পারি, কিন্তু নালিশ করতে পারিনে। করছিও না। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বড়ো এক অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে আছে —যা, শুধু আমি নই, সমস্ত সৃষ্টি, সৃষ্টির আরম্ভ থেকে অবিচ্ছিন্ন জীবন-প্রবাহ তোমার বিরুদ্ধে আনছে ; তুমি প্রেমকেই অস্বীকার করেছো জীবনে। প্রেম কখনো গোপন করা যায় না ; তোমার মনে যদি আলো জ্ব'লে উঠতো,

তাহ'লে তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই আমি তা দেখতে পেতাম, আমার কাছ থেকে কিছুতেই তা লুকোতে পারতে না। আকাশের সকল দেবতা তাহ'লে খুশি হ'তেন, আর আমি—তোমার অন্যতম ভক্ত মাত্র—আমি তোমাকে উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ জানাতাম; নিজের পরম সম্ভাবনাকে পূর্ণ করছো ভেবে তোমারই কাছে কৃতজ্ঞ থাকতাম আমি। কিন্তু সেই শুভ ঘটনার কোনো লক্ষণই তোমাতে দেখছি না; আত্ম-বঞ্চনা আজ তোমার ধর্ম, আত্ম-যন্ত্রণা আজ তোমার আদর্শ। শরীরের ও মনের, ইন্দ্রিয়ের ও আত্মার বিচিত্র সব অনুভূতি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা; এক কথায়, ম'রে-যাওয়া। অমানুষ, এমনকি অ-প্রাণী হ'য়ে যাওয়া। কে না একজন ব'লে গেছেন যে আমাদেরকে মানুষ হ'তে গেলে আগে প্রাণী হওয়া দরকার? তন্ত্র-সাধন শেষ হ'লে তবে মন্ত্র-সাধন। মানুষের চেয়ে বড়ো হ'তে গিয়ে তুমি প্রাণীরও নিচে নেমে যাচ্ছো, উমা। যারা নিছক প্রাণী, তাদের চিন্তা করবার ক্ষমতা নেই—কিন্তু তার ফলে তাদের একটা লাভ হয়েছে এই যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে আত্মঘাতী বিদ্রোহ তারা করে না। তুমি যা করছো। তুমি নিজেকে সংবরণ ক'রে রাখছো, নীতি-শিক্ষার বইয়ে যাকে সংযম বলা হয়। এতে তোমার শরীরের ও মনের যে-কষ্টটা হ'চ্ছে, সেটাই তোমাকে সুখ

দিচ্ছে ; নিজেকে কষ্ট দিতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না, এই মিথ্যা গর্ব নিয়েই তুমি বেঁচে আছো। তোমার উন্মীলিত হৃদয়ের সমস্ত উন্মুখতা এমনি ক'রেই পরিতৃপ্ত করছো তুমি—নিজেকে দিন-রাত চাবুক মেরে। উমা, এ-ও এক বিকৃতি, পৈশাচিকতা। কথাটা কড়া হ'য়ে গেলো, কিন্তু অন্যায় হয় নি। কেননা, মানুষের ধর্মে নিজের উপর অত্যাচার করবার বিধান নেই। স্বাভাবিক উন্মুখতার স্বাভাবিক পরিতৃপ্তিই ঘটাতে হয়। নইলে বিকৃতি আসবেই। তোমার যেমন এসেছে। তোমার শারীরিক যৌবনকে অস্বীকার করা অসম্ভব, কিন্তু তোমার যৌবনাপন্ন মনকে যথাসম্ভব হলদে, শুকনো, বুড়ো ক'রে ফেলবার অশ্রান্ত চেষ্টা করে' তুমি ক্রমশ কুৎসিত হ'য়ে যাচ্ছো। যৌবন —সৌন্দর্যের, আনন্দের, ঐশ্বর্যের সময়। বিস্মিত, মুগ্ধ, অভিভূত, উচ্ছ্বসিত হবার সময়। প্রতি মুহূর্তে নব-নব স্পন্দন অনুভব করবার, নব-নব আনন্দ আবিষ্কার করবার সময়। অল্প বয়সে যে-সব ছেলেমেয়ে মারা যায়, তাদের কথা ভেবে আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়, কারণ, কত আশ্চর্য অনুভূতির স্বাদ যে তারা পেলো না, তারা তা জানতেও পারলো না। তেমনি, তোমার কথা ভেবেও আমার দুঃখ হ'চ্ছে। উমা, তুমি তোমার যৌবনের সঙ্গে সত্যাগ্রহ করছো ; কিন্তু ঈশ্বরের আইনের disobedience—তা

যতই civil হোক না—হাতে-হাতে কঠোর শাস্তি নিয়ে আসে। *উমা, এ-বয়সে তোমার পক্ষে সুন্দর না-হওয়া পাপ ;* এ-বয়সে তোমার পক্ষে জীবনকে বরণ না-করা মহাপাপ।

'এত স্পষ্ট ভাষায় এ-সব কথা কেউ বলে না ; যদিও মনে-মনে সবাই ম'রে যাবে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কখনো বলবে না। এমন কে কোথায় আছে যে তার হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়ে জীবনের পূর্ণতাকে কামনা না করে ? —কিন্তু বাইরে আমরা সবাই ভালোমানুষ, ভদ্রলোক সেজে থাকি—পরস্পরের কাছে এমন ভাণ করি, যেন আমাদের জীবনে টাকাকড়ি আর খবরের কাগজ ছাড়া কিছু নেই। ভালোবাসাকে আমরা দুর্বলতা মনে করি, তাই তা প্রকাশ করতে আমাদের লজ্জার সীমা নেই। কোনো-কোনো লোকের পক্ষে এই লজ্জা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঠেকে ; তাই শ-র নায়ক আহতস্বরে ব'লে উঠেছিলো "—shy ! shy ! shy !" সামান্য টাইপিস্ট মেয়ের সঙ্গে তরুণ কবি নিজের সাদৃশ্য খুঁজে পেলো—ওরা দু'জনেই shy ! shy ! shy ! পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের মতো। তুমি—উমা দেবী, তুমিও shy ! ভালোবাসাকে গোপন করবার জন্য প্রসার্পাইনকে হ'তে হয়েছিলো Pruder তোমাকে হ'তে হয়েছে rude ; প্রসার্পাইনএর বর্ম ছিলো টাইপরাইটার ; তোমার, চর্‌কা।'

৩

'কেন তুমি আমার কাছে চিঠি লেখো?' সাপ্তাহিক 'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ শেষ ক'রে নিরঞ্জনের দিকে মুখ ফিরিয়ে উমা জিগেস করলে. 'কেন তুমি আমার কাছে চিঠি লেখো, নিরঞ্জন?'

কেননা সকালে উমার কাছে চিঠি ডাকে দিয়ে বিকেলে নিরঞ্জন সশরীরে উমার বাড়িতে (মানিকতলায়) গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। সাধারণত পরের দিন বিকেলে যায়, কিন্তু আজ ওর সবুর সয়নি।

নিরঞ্জন চুপ ক'রে রইলো।

'আর, লেখোই যদি, তাহ'লে খামকা ডাকে ফেলে পয়সা নষ্ট করো কেন? সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে আমাকে প'ড়ে শোনালেই তো পারো। তুমি কথা বলতে থাকলে তোমাকে দেখে কষ্ট হয়; তুমি চিঠি লিখলে তোমার হাতের লেখা পড়তে আরো বেশি কষ্ট হয়; সুতরাং, এ-ছাড়া তো আর আমি উপায় দেখিনে। তুমি কী বলো?' উমা চিন্তিতমুখে ঠোঁটের এক কোণ কামড়ালো।

নিরঞ্জন কিছুই বললো না।

'সত্যি—তোমার হাতের লেখা! কয়েকবার চেষ্টা করেছিলাম—তারপর ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল তোমার

চিঠি এলে আমার সহকারীকে দিই—বেলা কিছুদিন ইশকুলে কাজ করেছে, নানারকম হাতের লেখা দেখে অভ্যেস আছে। অনেক চেষ্টা ক'রে প্রায় আগাগোড়াই উদ্ধার করতে পারে। আশ্চর্য ক্ষমতা ওর। আজও ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম ;—এই ছাখো, তোমার চিঠি এখনো খুলিনি।'—উমা টেবিলের উপর ছোটো একটি চিঠির স্তূপ থেকে নিরঞ্জনের পুরু, খশখশে খাম টেনে বা'র করলো—'কিন্তু বেলার আগে তুমি নিজেই যখন এসে উপস্থিত, ওর কাজটা তুমিই না-হয় করো। কী বলো?'

কিন্তু এবারেও নিরঞ্জন কিছু বললে না।

'আচ্ছা, নিরঞ্জন, তুমি একটা টাইপরাইটর কিনে নাও না। ইংরেজি ভাষায় তোমার লিখতেও সুবিধে হবে, আমিও সহজেই পড়তে পারবো।'

'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদক বললেন: 'বাংলা টাইপরাইটরও বেরিয়েছে।'

নিরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

উমা বললে, 'আমাকে চিঠি না-লিখে কি তুমি পারোই না, নিরঞ্জন? লেখবার কোনোই দরকার নেই—তাই বলছি। খাম না-খুলেই আমি বুঝতে পারি, ভিতরে কী আছে। (আর, সব চিঠিতে তুমি প্রায় একই কথা লেখো না কি?) ধরো: এ-চিঠি। বলবো, তুমি কী

লিখেছো ? লিখেছো অনেক কথাই, কিন্তু, তার সারমর্ম হচ্ছে : খদ্দরে মেয়েদের সুন্দর দেখায় না। তা-ই না ?'

'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদক অল্প-একটু হাসলেন : 'হুঁঃ-হুঁঃ !'

উমা বললো, 'তাছাড়া, চিঠি লিখে যখন কোনো জবাব পাও না। জবাব দিতে আমার যে অনিচ্ছা তা নয় ; কিন্তু কিছু-একটা লিখতে হ'লে আমি কোনোকালেও কাগজ-কলম-পেন্সিল কিছু খুঁজে পাইনে। তাই লেখা আর হয় না। আমার নামে কাগজে যে-প্রবন্ধগুলো বেরোয়, তা-ও আমি নিজে লিখি না ; dic—* মুখে বলি, বেলা লিখে নেয়।'

'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদক বললেন, 'কী আবেগময়ী ভাষা ! কী গভীর চিন্তাশীলতা ! আপনার প্রবন্ধগুলো—'হাত আর মাথা নেড়ে তাঁর বাকি অর্থ প্রকাশ ক'রে তিনি চুপ করলেন।

'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদক যখনই মনের কোনো প্রবল ভাবাবেগের পক্ষে যথেষ্ট প্রবল ভাষা খুঁজে পান না, তখনি মুখের কথা অসমাপ্ত রেখে হাত আর মাথা নাড়েন। লেখাতেও তাঁর এ-কায়দা ; কথার জন্য আটকে

---

* বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে—এমনকি, সাধারণ আলাপেও উমা দেবী কথনো ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেন না ব'লে তিনি বিখ্যাত।

গেলেই 'বর্ণনার অতীত!' ব'লে সারেন। বিস্ময়-চিহ্ন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় যতি-সংকেত;—এ-বিষয়ে 'বিস্মরণী'র সুপ্রসিদ্ধ কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। 'বিদ্রোহী'র কোন-কোন অংশ তাঁর লেখা, তা 'বিদ্রোহী'র নিয়মিত পাঠকরা অনায়াসে বুঝতে পারেন; কারণ বাংলাদেশের জীবিত লেখকদের মধ্যে আর কারো মনে এত জোর নেই (পূর্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ কবি ছাড়া) যে তিন ইঞ্চি কাগজের মধ্যে তেরোটা বিস্ময়-চিহ্ন ছিটিয়ে দিতে পারেন। তা ছাড়া, তাঁর একান্ত নিজস্ব ট্রেড-মার্ক 'বর্ণনার অতীত' তো আছেই। খবরের কাগজ মহলে তিনি 'বর্ণনার অতীত'-বাবু ব'লে পরিচিত। ছোটোখাটো, গোলগাল মানুষটি; মাথায় টাক পড়ি-পড়ি করছে; মুখে দু'দিনের দাড়ি-গোঁফ জমেছে। পরনে (বলাই বাহুল্য) অসম্ভব মোটা খদ্দর—আধ-ময়লা; চোখে অসম্ভব পাওয়ারের চশমা—এত পুরু চশমা যে তার পিছনে 'বর্ণনার অতীত'বাবুর চোখ আছে কি নেই, বোঝা যায় না।

'বর্ণনার অতীত'-বাবু বললেন 'আপনার প্রবন্ধগুলো—!'

নিরঞ্জনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে উমা বলতে লাগলো: 'দেখুন, আমার সামনের সপ্তাহের প্রবন্ধটা কাল সকালে ঘণ্টা-খানেকের জন্য একটু পাঠিয়ে দিতে পারবেন কি? দু' এক জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে।

আর, সুভাষবাবুর যে-নতুন ছবিখানা পেয়েছেন, তা আর্ট-কাগজে ছাপানো সম্ভব হবে কি? ছবিখানা ভালো—তাই বলছি। আর-এক কথা। "খদ্দর ভাণ্ডারে"র বিজ্ঞাপনের হার আপনারা কিছু কমিয়ে দিতে পারলে ভালো হয়। নতুন দোকান—গোড়ায় আপনাদের একটু সাহায্য না-পেলে দাঁড়াবে কী ক'রে? ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিন কথা হচ্ছিলো। বললেন—তাঁর দোকানের মজুতি সব কাপড় আগাগোড়া চরকার সুতোয় তৈরি। মিথ্যে যে বলেছেন, তার কোনো প্রমাণ পাইনি।...এই যে, বেলা। এত দেরি করলে কেন? তোমার জন্যেই ব'সে আছি। বোসো। চেৎলা মহিলা-সমিতি থেকে এই চিঠি এসেছে; কালকেই জবাব দিয়ে দিয়ো। আমরা সপ্তাহে তু'দিন—মঙ্গলবার...আর শনিবার এক ঘণ্টার জন্যে দরজি পাঠাতে পারি—দেড়টা থেকে আড়াইটা। মাসে এক টাকা: সভা-পেছু তু'পয়সাও পড়বে না। মেদিনীপুর কংগ্রেস কমিটিতে পঁচিশটা চরকা পাঠাতে হবে। আমাদের তকলিগুলো সুবিধের হচ্ছে না;—তাছাড়া, রাস্তায়-রাস্তায় আরো বেশি ফেরি হওয়া উচিত। সময় যাদের কম, তাদের পক্ষে চরকার চেয়ে তকলিই বেশি ব্যবহার্য; এর আরো বেশি প্রচার আবশ্যক।...হ্যাঁ, মাড়োয়ারি নারী-সংঘকে টেলিফোনে জিগেস করো তো,

কাল কলেজে পিকেটিং করবার জন্যে তাঁরা ক'জন স্বেচ্ছা-সেবিকা দিতে পারবেন।...বারো জন? বেশ। ব'লে দাও, দশটার সময় বড়োবাজার কংগ্রেস কমিটির আপিসে জড়ো হ'তে। আর, ছাত্র-সংঘের কার্যাধ্যক্ষকে লিখে দিয়ো, ষোলো বছরের নিচে যাদের বয়েস তাদের যেন পাঠানো না হয়। মদের দোকানের জন্য বেশ শক্ত ছেলে দরকার; মাতালগুলোর আবার কাণ্ডজ্ঞান নেই, মার-ধর করে। তুমি নিজে কাল কলেজ স্ট্রীটে থেকো; কাপড়ের দোকানগুলোর তত্ত্বাবধানে। শুনলাম, অনেক জাপানি কাপড় দিশি ব'লে চালানো হ'চ্ছে। আর, বাগবাজার নারী-শিক্ষা-মন্দিরকে লিখে দিয়ো, সম্প্রতি, মাসখানেকের জন্য, শ্রীমতী ললিতা বাগচি সপ্তাহে তিনদিন ক'রে সংস্কৃত ক্লাশের ভার নিতে পারেন। কিছু দিতে হবে না। আর, ঢাকা থেকে সরলা নাগের একটা জরুরি চিঠি এসেছে; তার জবাবটা এখনি লিখে' নাও।..."মাননীয়াসু: আপনার চিঠি..."

নিরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে পাঞ্জাবির দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘর-ময় পাইচারি করতে লাগলো। (পকেটের মধ্যে তার হাতের আঙুল-গুলোর অস্থৈর্যের আর বিরাম নেই।) উমা অভিনেত্রী হবার জন্যে জন্মেছিলো—নিরঞ্জন ভাবতে লাগলো—কিন্তু

হ'তে-হ'তে ও হ'লো কিনা বক্তৃতা-দেনে-ওলা। দেশসুদ্ধ লোক ওর বক্তৃতার বাহবা দিচ্ছে। ওর স্থান নাকি সরোজিনী নাইডুর পরেই ; ওর বাংলা নাকি সরোজিনী নাইডুর ইংরিজির মতোই অনর্গল ও প্রবল ; কোথাও আটকায় না, কথার জন্য ঠেকে' যায়না, থতমত খায় না—অনায়াস গতিতে তরতর ক'রে চলে ; শর্টহ্যাণ্ডে টুকে নিতেও প্রেসের লোকরা হাঁপিয়ে পড়ে। লোকে তা-ই বলে। নিরঞ্জন নিজে অবশ্য কখনো শোনেনি। জনসভার কথা মনে করলেই ওর গায়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। তবু, উমা যখন তার সরকারি মশনদে (উত্তর কলিকাতা মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা ; বড়োবাজার কংগ্রেস কমিটির খদ্দর বিভাগের পরিচালিকা ; 'বিদ্রোহী'র সম্পাদকীয় পরিষদের সভ্য ; শ্যামবাজার স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর নেত্রী—ছোটো-খাটো পদগুলো ছেড়েই দিচ্ছি) গদীয়ান হ'য়ে বসে, তখন ওকে বিখ্যাত বক্তা (না বক্ত্রী ?) ব'লে কল্পনা করা শক্ত নয়—যেমন এখন। অনর্গল কথা ব'লে যাচ্ছে—এ-কথা, ও-কথা সে কথা—একটার পর একটা, নির্বিঘ্ন স্বাচ্ছন্দ্যে ব'লে যাচ্ছে। ওর কণ্ঠস্বরে, নদীর স্রোতের মতো আবেগ ; মৃদু, কিন্তু পরিপূর্ণ, মসৃণ। একটু একঘেয়ে বক্তৃতা দিতে-দিতে হয়েছে। আরো হয়েছে : ওর সব কথাই এখন বক্তৃতার অংশ মনে

হয়। ভাষায় যেন ব্যক্তিত্বের লালিত্য নেই, আছে জনতার মত্ততা। একজন মানুষ যে আর-এক জনের সঙ্গে আলাপ করে—এমন কি, গল্পও করে—তা যেন ও ভুলে গেছে ; এক-জন লোক এক হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে শুধু ; এর বেশি কিছু না। উমা আজকাল বাইরে এবং ঘরে—সর্বত্রই বক্তৃতা করে, কথা বলে না। ওর সব কথাই অত্যন্ত ঠাণ্ডা, অত্যন্ত ভদ্র, তাতে ব্যবসার মসৃণ পরিচ্ছন্নতা—সব কথাতেই একটু যুদ্ধং দেহি ভাব : রাজনৈতিক বক্তৃতা দেয়ার ফল এটা। ধরা যাক, ও যদি জিগেস করে : 'ভালো আছেন ?' তাহ'লে মনে হবে, ও বলছে : 'ভালো নেই, বলছেন ? আমার সঙ্গে ও-সব চালাকি চলবে না, ভালো আপনাকে থাকতেই হবে।' আর, কেমন-যেন একঘেয়ে, সব সময় একই সুর চলছে ; ওর কণ্ঠস্বরের সূক্ষ্ম মীড়-গুলো হারিয়ে যাচ্ছে। এক হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত চীৎকার করতে থাকলে তা হবেই। বলতে-বলতে মাঝে-মাঝে থেমে যাওয়াতেই কথার রস, কিন্তু কথার জন্য ওকে কখনো হাৎড়াতে হয় না, ভাষার উপর—এবং যা আরো বেশি—নিজের মনের উপর আশ্চর্য দখল। নির্ভীক, সুস্পষ্ট উচ্চারণ ; পরিষ্কার, নির্ভুল ভাষা—কোনো ফাঁক নেই, জোড়াতালি নেই। ঠিক বক্তৃতার মতোই শুনতে।

হোক—তবু, আশ্চর্য। কী ক'রে মানুষ এত ভালো ক'রে কথা বলতে পারে? নিরঞ্জন কিছুতেই ভেবে পায় না। কোনো সন্দেহ নেই: অভিনেত্রী হবার জন্যেই ও জন্মে-ছিলো। নিরঞ্জন উমার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো। ওর dic—'মুখে বলা' একটু শুনলো: বর্তমান সময়ে আমাদের বয়নালয়ে আটটি তাঁত চলিতেছে; তন্মধ্যে ছয়টি —লিখেছো?—ছয়টি খদ্দরের জন্য ও দুইটি মুগা, তসর প্রভৃতির জন্য…নিয়োজিত হয়। বয়নালয়ে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিচারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অল্পদিন যাবৎ আমরা একটি রঞ্জন-বিভাগও খুলিয়াছি। এখন পর্যন্ত ভালো রঙের খদ্দর…অত্যন্ত বিরল।' নিরঞ্জন নিজের অজান্তে ব'লে ফেললো, 'ঠিকই।' বেলা কাগজ থেকে মুখ তুলে একবার ওর দিকে তাকালো, কিন্তু উমা একভাবে ব'লে চললো: 'প্যারাগ্রাফ। প্রত্যেক বড়ো শহরে এই রকম বয়নালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। আপনি যদি সচেষ্ট হন, তবে ঢাকায়…'

নিরঞ্জন দূরে স'রে গেলো। কিন্তু ঘরের ওপার থেকে উমার একঘেয়ে গলার আওয়াজ ওর কানে এসে বাড়ি দিচ্ছে; অনবরত। টেবিলের উপর নুয়ে-পড়া বেলার মাথার খোঁপার উপর দৃষ্টি আবদ্ধ ক'রে ও ভাবতে লাগলো: উমার মন কী আশ্চর্যরকম সাজানো-গুছোনো।

পরিপাটি দেরাজের মতো ; প্রত্যেক জিনিশের জন্য আলাদা-আলাদা তাক—নম্বর-দেয়া, লেবেল-আঁটা ; কখনো কোনো ভুল হয়না, এ-তাকের জিনিশ ও-তাকে চ'লে গিয়ে গোলমাল বাধায় না ; চোখের নিমিষে যে-কোনা জিনিশ বা'র করা যায় ; আবার দরকার শেষ হওয়া মাত্র সে-তাক ভিতরে ঠেলে দিয়ে অনেক দূরের আর-এক তাক থেকে পরের মুহূর্তের দরকারি জিনিশটি বাইরে আনা যায়। কলের মতো নিখুঁত, নির্ভুল ; কলের মতো সময়-বাঁচানো, শ্রম-কমানো। এরই নাম যোগ্যতা, এরই পুরস্কার কৃতিত্ব। কুক্কুরী-কৃতিত্ব। 'That bitch-goddess, Success !'

ঘুরতে-ঘুরতে নিরঞ্জন আবার উমার টেবিলের ধারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। উমা ততক্ষনে চিঠি শেষ ক'রে আনছে : 'এ-বিষয়ে আপনার মতামত জানিতে পারিলেই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিব। নিবেদন ইতি।'

নিরঞ্জন টেবিলটার গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জিগেস করলো, 'তোমার কাজ শেষ হ'লো, উমা ?'

উমা বললো, 'টেবিলটার গায়ে ও-রকম ক'রে ভর দিয়ো না, নিরঞ্জন ; বরং ঐ ইজি-চেয়ারটায় বোসো।—চিঠিটা একবার পড়োতো, বেলা।'

'আঃ, কী মুশকিল !' ব'লে নিরঞ্জন স'রে গেলো।

রাস্তার দিকের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে মাথার চুলগুলো নিয়ে খানিক টানা-হেঁচড়া করলে। 'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদক ঠায় এক ভাবে ব'সে পাটের চাষ সম্বন্ধে একটা প্যামফলেট পড়ছিলেন; নিরঞ্জন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বিঃ-সঃ-সঃ ওর দিকে এক জোড়া চশ্‌মা (কেননা, চোখ দেখা যায় না) তুলতেই জিগেস করলো, 'আপনি বিয়ে করেছেন?'

'বর্ণনার অতীত'-বাবু বললেন, 'না। বিবাহ, আমার মতে—!'

নিরঞ্জন জিগেস করলো, 'কোনো দিনই করেন নি?'

বিঃ-সঃ-সঃ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মুখের চেহারা ভয়ংকর ক'রে বললেন, 'মানে?'

দূর থেকে উমার আদেশ এলো, 'ক্ষমা চাও, নিরঞ্জন!' বেলা মুখ ফিরিয়ে একবার তাকালো।

নিরঞ্জন অবাক হ'য়ে বললো, 'আমি কী করেছি—কী বলেছি—কিসের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে?'

'সে আমি তোমাকে পরে বলবো—এখন ক্ষমাটা চেয়ে নাও তো।'

নিরঞ্জন অভিমানিত শিশুর মতো বললে, 'আচ্ছা। তা-ই তবে। ক্ষমা করবেন।' জানলার দিকে ফিরে যেতে-যেতে সে শুধু বললে: 'নাঃ!'

হতাশ হ'য়ে নিরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আর নিরঞ্জন যখন হতাশ হ'য়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তখন এক সিগারেট খাওয়া ছাড়া আর কী সে করতে পারে? কিন্তু, নিরঞ্জন দেশলাই জ্বালাতে পারার আগেই বিঃ-সঃ-সঃ তীক্ষ্ণস্বরে ব'লে উঠলেন: 'সিগারেট খাচ্ছেন?' নিরঞ্জন এমন চমকে উঠলো যে তার হাত থেকে জ্বালানো কাঠিটা প'ড়ে গেলো। দেশলাইয়ের আর-একটা কাঠি বা'র করতে-করতে সে বললে, 'আপনি খাবেন একটা?'

'আমি? আমি খাবো?' চীৎকার করতে গিয়ে 'বর্ণনার অতীত'-বাবুর গলা ভেঙে গেলো। 'আপনি আমাকে এ-কথা জিগেস করতে সাহস পেলেন?'

নিরঞ্জন ম্লানমুখে বললো, 'ও, আপনি বুঝি ধূম-পান-নিবারণী সভার প্রেসিডেন্ট?' তারপর, একটু আগেকার কথা মনে ক'রে: 'ক্ষমা করবেন।' সমস্ত বুক ভ'রে ধোঁয়া টেনে নিয়ে সে ঠোঁট গোল ক'রে আস্তে-আস্তে বা'র করতে লাগলো। হঠাৎ তার সুনীলের কথা মনে পড়লো; সুনীল আশ্চর্য ring তৈরি করতে পারে। ইচ্ছে করলেই পারে। আর সে—অনেক চেষ্টা ক'রেও...

'দেশের জন্য কত লোক প্রাণ দিচ্ছে, আর আপনি সামান্য নেশার জন্য এখনো বিলেতকে পয়সা দিচ্ছেন! লজ্জা করে না আপনার?'

নিরঞ্জন ফ্যালফ্যাল ক'রে বিঃ-সঃ-সঃ-র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'উমা বললো, 'তা ছাড়া, নিরঞ্জন, তোমার স্বাস্থ্যের কথাও ভাবা উচিত।'

বিঃ-সঃ-সঃ নিরঞ্জনের কাছে এসে হাত-জোড় ক'রে বলতে লাগলেন, 'দয়া ক'রে ওটা ফেলে দিন। ফে লে দি ন। **ফেলে দিন**।'

নিরঞ্জন কোনো কথা না-ব'লে জানলা দিয়ে 'ওটা' রাস্তায় ফেলে দিলো। বিশাল অরণ্য এই পৃথিবী; অন্ধকার রাত; নিরঞ্জন একা, নিরঞ্জন পথ হারিয়েছে। যে-দিকে পা বাড়ায়, হোঁচট খায়। নিরঞ্জন এখন শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করুক।

বিঃ-সঃ-সঃ বিদায় নিলেন। বিজয়ের গর্বিত হাসি তাঁর মুখে। মাতৃভূমির সামান্য একটু সেবা করতে পেরেছেন ব'লেও তাঁর মনে তৃপ্তি আর ধরে না।

বেলা এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলো; এইবার নিরঞ্জনকে জিগেস করলো, 'চা দেবো?'

ইজি-চেয়ারে শুয়ে নিরঞ্জনের নিজেকে একটা মাড়ানো পোকার মতো মনে হচ্ছিলো। তাই এই প্রশ্ন শুনে হঠাৎ সে বেলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো! বেলা নিতান্ত দয়া ক'রে তাকে একটু সান্ত্বনা

দিতে চাচ্ছে ; বেলার তবু দয়া আছে। সোজা হ'য়ে ব'সে প্রাণপণে ছ'হাত মোচড়াতে-মোচড়াতে সে বলতে লাগলো : 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ…'

উমা ওর কথা কেটে দিলো : 'তোমার বিলিতি ভদ্রতার বুকনিগুলো অস্থানে এবং অপাত্রে প্রয়োগ করছো, নিরঞ্জন। বেলা এর মর্যাদা বুঝবে না।'

কিন্তু বেলা শুধু বললো, 'বস্থন : চা ক'রে আনছি।'

*　　　*　　　*

'বেলা মনে করে, নিরঞ্জন', ঠোঁটের এক কোণে হেসে উমা বললো, 'যে তুমি আর আমি পরস্পরের প্রেমে পড়েছি। তাই, চায়ের অছিলায় ও উঠে গেলো।'

'নেহাৎ মিথ্যে মনে করে না', নিরঞ্জন বললো, 'আমি তো অনেকদিন যাবৎই তোমার প্রেমে প'ড়ে আছি। তোমার কথা জানিনে।'

উমা এতক্ষণে ওর সরকারি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালা। টেবিলের উপর কাগজপত্র সব ছত্রখান হ'য়ে প'ড়ে আছে—বেলা প্রেমিকযুগলের স্থবিধে ক'রে দেবার জন্য আর-একটু পরে উঠলেও পারতো। উমা নিজেই সেগুলোর ব্যবস্থা ক'রে রাখতে লাগলো। যেগুলো দরকারি, সেগুলো বাঁ দিকের বেতের বাসকেটে ;

বাকিগুলো বাজে কাগজের ঝুড়িতে। হঠাৎ একটি সাপ্তাহিকের ভাঁজের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো নিরঞ্জনের সেই চিঠি। তাই তো, এটারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে উমা নিরঞ্জনের ইজি-চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালো। বললো, 'এখন প'ড়ে শোনাবে?' তারপর একটু ভেবে জুড়ে দিলে, 'এখন সময় আছে আমার।' কিন্তু কথাটা তার মুখ থেকে না-বেরুতেই তার অনুতাপ হ'তে লাগলো। নিরঞ্জনকে আঘাত করা এত সোজা ব'লেই তাতে কোনো সুখ নেই।

কিন্তু নিরঞ্জনও যে ঘা ফিরিয়ে দিতে না পারে, এমন নয়।—'দরকার কী, উমা?' নিতান্ত নীরসভাবে সে বললে, 'তোমার তো জাদুবিদ্যে-টিদ্যেই জানা আছে; খাম ছুঁয়েই ব'লে দিতে পারো, ভেতরে কী লেখা আছে।' একটু থেমে: 'স্বদেশি ক'রে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করছো, উমা। ইংরেজের দলে ভিড়ে যাও; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেয়ে-ডিটেকটিভ হিশেবে অক্ষয় কীর্তি রেখে যেতে পারবে।'

এই সময়ে উমা যা করলো, তা লিখতে আমার সাহস হচ্ছে না; কেননা, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে আপনারা মনে করবেন, আমি বানিয়ে বলছি; আর, বিজ্ঞ সমালোচকরা বলবেন যে উমার মতো মেয়ের পক্ষে এ-

আচরণ অশোভন, অসংগত, অসম্ভব; সুতরাং এতে 'truth' নেই; কাজে-কাজেই 'beauty'ও নেই, কেননা মহাকবি কীটস কি ব'লে যান নি যে 'Beauty is truth and truth beauty'? কিন্তু উমার মতো মেয়ের—আর, তা-ই যদি বলেন, যে-কোনো মেয়ের পক্ষে কী সম্ভব, আর কী সম্ভব নয়, তা বিচার করবার আপনি বা আমি কে? আর, যদিই বা কেউ হই, তাহ'লে বিচার করতেই বা যাবো কেন? চোখের উপর যা ঘটছে, তা স্বচ্ছন্দে কেন মেনে নেবো না? তা ছাড়া, পারিভাষিক 'সত্য' (যা= 'সৌন্দর্য') সৃষ্টি করবার জন্য আমি এ-বই লিখছি না, আপনাদের এ-বই প'ড়ে ভালো লাগবে এই শুধু আমার আশা, আর উমার এই অসংগত আচরণ আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে; তাই তা লিপিবদ্ধ করতে আমার একটুও সংকোচ হচ্ছে না।

তাহ'লে জানবেন যে নিরঞ্জন ওর কথা শেষ করা মাত্র উমা ওর ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর গিয়ে বসলো; ব'সে এক হাত দিয়ে ওর ঘন চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে (আর-এক হাতে নিরঞ্জনের চিঠিখানা ধরাই আছে) বললে, 'তোমার চিঠিভরা তো এমনি সব কড়া-কড়া কথাই থাকে, নিরঞ্জন; সেইজন্যই তো পড়তে ইচ্ছে করে না। নিরঞ্জন—' উমা আর-একটু কাছে ঘেঁষলো, ওর

শাড়ির আঁচলের খানিকটা নিরঞ্জনের কাঁধে লুটিয়ে পড়লো, 'তোমার এ-চিঠি তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও ; যদি কখনো মিষ্টি ক'রে লিখতে পারো, লিখো।' উমা আরো একটু কাছে ঘেঁষলো ; ওর কাঁধ নিরঞ্জনের কানে এসে লাগছে।

উমার খদ্দরের আঁচলটা নিরঞ্জনের গালে খশখশে লাগছিলো, কিন্তু এমন-এক মুহূর্তে সে খদ্দরকেও ক্ষমা করতে পারে। কতদিন পর উমার কাছ থেকে এই একটু আদর ও পেলো! হয়তো উমাকে ও ভুল বুঝে' আসছে। এই মুহূর্তে তো ওর মনে হচ্ছে (এবং এমন মুহূর্ত আগেও আরো এসেছে) যে উমা ওকে ভালোবাসে। কিন্তু···যাক, সে কিছু ভাবতে চায় না ; ওর বুকের মধ্যে তোলপাড় চলছে। উমা যা খুশি তা-ই হোক, যা খুশি তা-ই করুক, ও জোর করবার কে ? দাবি করবার কে ? প্রশ্ন করবার কে ? শুধু মাঝে-মাঝে উমা এমনি ক'রে ওর চুলে আঙুল বুলিয়ে দিক, তাহ'লেই ও সব সহ্য করবে ; তা হ'লেই ও তৃপ্ত থাকবে। দূর হোক ওর চিঠি—আর ও-সব লিখবে না। উমার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে ও দু'টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর গভীর আবেগে উমার একটি হাত চেপে ধরলো নিজের দু'হাতের মধ্যে।

উমা বললো, 'দাড়ি কামাতে গিয়ে গাল কেটে ফেলেছো দেখছি? গলা যে কেটে ফ্যালো না, তা-ই আশ্চর্য।'

কিন্তু নিরঞ্জনের মনে এই ব্যঙ্গোক্তি একটু আঁচড়ও কাটলো না; উমার গন্ধ মাখা হাত দুটি ও নিজের মুখের উপর চেপে ধরলো।

একটু হেসে উমা বললে, 'ছেলেমানুষ!'

হঠাৎ কী যে হ'লো, উমা তা ঠিক বুঝতে পারলো না। হঠাৎ—এমন হঠাৎ নিরঞ্জন চেয়ার ছেড়ে উঠলো যে উমার আশ্রয়হীন শরীর টাল সামলাতে না-পেরে ধপাশ ক'রে ইজিচেয়ারের মধ্যে প'ড়ে গেলো। উমা তাকিয়ে দেখলো, নিরঞ্জন তার দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

উমা অনেকটা নিজের মনে প্রশ্ন করলো, 'কী হয়েছে?'

নিরঞ্জন আচমকা ঘুরে ওর দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালো; এবং নিরঞ্জনের মুখ দেখার সঙ্গে-সঙ্গে উমার কিছুই বুঝতে বাকি রইলো না। নিরঞ্জনের আসন্ন বিস্ফোরণের জন্য তৈরি হ'তে-হ'তে ও ভাবলো, ছেলেমানুষ বললে যে চ'টে যায়, সে ছেলেমানুষ ছাড়া আর কী?

কিন্তু বিস্ফোরণ তক্ষুনি হ'লো না। ওরও তো তৈরি হওয়া দরকার এবং যে-কোনো কঠিন কাজের জন্য তৈরি

হ'বার পক্ষে সিগারেটের মতো এমন জিনিশ আর-কী আছে? নিরঞ্জন ছ'আঙুলের মধ্যে সিগারেটটাকে একটু আদর করলে; তারপর সেটা ধরিয়ে উমার কাছে এগিয়ে এলো।

ওর চোখের উপর চোখ রেখে উমা বললে, 'তবু খাচ্ছো?'

নিরঞ্জন—ওর পক্ষে—প্রশংসনীয় ধৈর্যের সঙ্গে আরম্ভ করলো, 'তবু মানে? তুমি কি ভেবেছো তোমার ঐ সহকারী সম্পাদকের কথায় আমি তখন সিগারেট ফেলে দিয়েছিলাম? কিন্তু ভদ্রলোক আর-একটু হ'লেই একটা সীন ক'রে আনছিলেন, আর সীন আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না।···তার চেয়ে খানিকক্ষণ না-হয় সিগারেট না-ই খেলাম।'

নিরঞ্জন বললো, 'লোকে মনে করে, আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়া খুব সোজা। কথাটা একেবারে মিথ্যেও নয়; আমি ঝগড়া করতে ভালোবাসি না, এই সুবিধে পেয়ে অনেকেই আমাকে চোখ রাঙায়। কিন্তু তুমি আমার হৃদয় রাঙিয়েছো, উমা, তোমার রাঙা চোখকে আমি ভয় পাই না। এই সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটাই ধরো। সহকারী সম্পাদক মশাই আমাকে চড় বসিয়েও দিতে পারতেন; আমার শরীর দুর্বল, হয়তো আমি কিছুই

করতে পারতাম না। কিন্তু তুমি, উমা, তুমি যখন বললে, "তবু খাচ্ছো?"' তখন—নিরঞ্জনের স্বর আস্তে-আস্তে চড়তে লাগলো, 'সেই কথার পিছনে যে-দম্ভ ছিলো, যে-অবহেলা ছিলো, তা-ও আমার চোখে পড়বে না, অত বোকা আমি নই। সে-দম্ভ আর সে-অবহেলা আমি সহ্য করবো, অত দুর্বল ও নই আমি। উমা, তুমি আমাকে কথায়-কথায় ঠাট্টা করো, তা আমি জানি। যখন তুমি আছো ব'লে ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম, সেই নিবিড় মুহূর্তে তুমি ব'লে উঠলে, "ছেলেমানুষ!" কথাটায় হয়তো আপত্তি করবার কিছু নেই, কিন্তু যে-ভাবে তুমি সেটা বলেছিলে, তোমার মুখ থেকে কথাটা যে-মানে নিয়ে বেরিয়েছিলো, তার জন্যে কোনোকালে তোমাকে যে ক্ষমা করতে পারবো, এটাই আশ্চর্য। অথচ, করবো—তা-ও ঠিক। এখনই ক্ষমা ক'রে বসে' আছি। তুমি তা জানো। তুমি জানো যে তুমি যা-ই করো না কেন, আমার মন কখনো ভাঙবে না। তাই আমাকে নিয়ে তুমি খেলা করছো,'—নিরঞ্জন একবার মুখের উপর হাত বুলিয়ে নিলো—'আমাকে সং সাজায়ে তুমি মজা দ্যাখো; বন্ধুদের কাছে তুমি আমাকে হাস্যকর ক'রে তুলেছো। তারা তোমার সম্বন্ধে যা বলে, উমা, খবরের কাগজে তা ছাপানো যায় না; তা শুনলে হয়তো তুমি একটু দুঃখিতই

হবে। তাদের কাছে আমি চুপ ক'রে থাকি বটে, কিন্তু মনে-মনে জানি যে ঠিকই বলে তারা। তবু তোমাকে আমি ভালোবাসি। আমাকে নাকি কোনো মেয়ে কখনো ভালোবাসতে পারে না, কিন্তু তোমাকে যে ভালোবাসি সেটা তো কেউ কেড়ে নিতে পারে না, উমা।' নিরঞ্জনের গলা ভেঙে গেলো; কান্নার মতো ক'রে ব'লে উঠলো, 'উমা, আমার উপায় হবে কী, বলতে পারো?'

সিগারেটটা আঙুলের বাড়ি খেয়ে-খেয়ে ছিঁড়ে গিয়েছিলো; সেটা ফেলে দিয়ে একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে নিরঞ্জন দুই হাতের ভিতর মুখ ঢাক্‌লো, আঙুলের ফাঁক দিয়ে ওর নিশ্বাস সবেগে বেরিয়ে আসছে।

'পারি, নিরঞ্জন,' উমা ওর সরকারি গলায় বলতে লাগলো, 'কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা কথা শুনে নাও। তোমার যা বলবার, তা তুমি বলেছো; এইবার আমার কথা শোনো। তোমার বন্ধুরা আমার সম্বন্ধে কী মনে করেন, তা আমি জানিনে। সুকুমার সেন যদি তাঁদের প্রতিনিধি হন, তাহ'লে তাঁদের মতামতের প্রতি বিশেষ যে মূল্য আরোপ করি, তা-ও নয়। তাঁদের মতামত প্রার্থনা না-ক'রে তুমি যদি আমার সাহায্য চাইতে, তাহ'লে আমিই তোমাকে সব বুঝিয়ে দিতে পারতাম। কারণ, নিরঞ্জন, তোমার মস্তিষ্ক খুব পরিষ্কার

নয়। সেখানে ধারণার চাইতে কল্পনাই বেশি। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে-ভাবতে—তোমার আশে-পাশে কী হ'চ্ছে না হ'চ্ছে, তা তুমি দেখতে শেখোনি। কোনো জিনিশই তোমার চোখে পড়ে না। ভারতবর্ষের মতো প্রকাণ্ড একটা দেশও নয়। আমি—যার সঙ্গে তুমি দু' বছরের উপর অন্তরঙ্গভাবে মিশছো, সে-ও নয়। এখন প্রতিবাদ কোরো না ; আর, পারো তো হাত দুটো অমন ক'রে মুচড়িয়ো না। আমার সঙ্গে যে তোমার কোনো মিল নেই, এ-কথাটা এতদিনেও তুমি উপলব্ধি করতে পারলে না। তোমার জীবন কল্পনা নিয়ে, আমার কাজ নিয়ে। আমার লক্ষ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ; তোমার বাংলা নাটকের পুনরুজ্জীবন। আমার মতে, তোমার কংগ্রেসে যোগদান করা উচিন ; তোমার মতে, আমার অভিনেত্রী হওয়া উচিত। দু'জনের বিশ্বাসই সমান দৃঢ়। তাই, মীমাংসা অসম্ভাব্য। আমি চরকা চালাই, বক্তৃতা দিই, পিকেটিং করি ; আর তুমি বই পড়ো, প্রেমে পড়ো, বিলিতি সিগারেট খাও। তুমি হয়তো বলবে, আমি আগে এ-রকম ছিলাম না ; কিন্তু আমার স্বভাবের মধ্যে এইটেই যদি সত্য না হবে, তাহ'লে আমার পক্ষে এ-রকম হওয়া সম্ভব হ'লো কী ক'রে। নিরঞ্জন, আমি তোমাকে পছন্দ করি, কিন্তু তোমার জগৎ আর

আমার জগৎ আলাদা—তোমাকে আমি ভালোবাসবো কেমন ক'রে ?'

'যেমন ক'রে একজন মেয়ে একজন পুরুষকে ভালোবাসে। তুমি মেয়ে, আমি পুরুষ, পরস্পরের উপর এই আমাদের সবচেয়ে বড়ো দাবি। দু'জনের যৌবন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মিল।'—নিরঞ্জনের মুখ থেকে তীব্রবেগে কথাগুলো বেরুতে লাগলো—'কী এসে যায়, তুমি যদি খদ্দর পরো, আর আমি বিলেতি সিগারেট খাই? কী এসে যায়, আমার মন যদি হয় কল্পনার বাসা, আর তোমার মন ধারণার কারখানা! ভালোবাসা এত ছোটো জিনিশ নয়, উমা, যে এই-সব ছোটোখাটো বৈষম্যও তাতে সইবে না। আমাদের মধ্যে কোনো মিল যদি না-ই থাকবে, তাহ'লে কেন আমি তোমাকে ভালোবাসি ? আমি যে তোমাকে ভালোবাসতে পারছি, তোমার প্রতি মুহূর্তের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তে ভালোবাসতে পারছি, তাতেই কি প্রমাণ হয় না যে কোনোখানে আপাতবৈষম্য ছাড়িয়ে অনেক নিচে, কোনো-এক অন্ধকার গভীরতায় আমাদের দু'জনের পরিপূর্ণ ঐক্য আছে ? আর সেই ঐক্য হ'চ্ছে আমাদের এই মধুর ও প্রধান বৈষম্য ; তুমি মেয়ে, আর আমি পুরুষ। তুমি আমাকে আকর্ষণ করো, এবং আমিও

তোমাকে আকর্ষণ করি ; না-ক'রেই পারি নে। তুমি শপথ ক'রে বললেও আমি বিশ্বাস করবো না যে মনে-মনে আমার প্রতি তোমার প্রবল আকর্ষণ নেই। কিন্তু তুমি যে শুধু স্বদেশি হয়েছো তা নয়, সন্ন্যাসী হয়েছো—মানে, ভণ্ড হয়েছো। আর সেখানেই আমার আপত্তি। তোমার ধারণা হয়েছে যে ভালোবাসা ছাড়াও মানুষ বাঁচে আর আমাকেও বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করছো যে আমাকে তুমি ভালোবাসো না। কাকে বাসো, শুনি ? কাউকেই না ; কেননা, ভালোবাসতে তুমি ভয় পাও। যদি সত্যি-সত্যি মনের কথা বলবার মতো সাহস তোমার থাকতো, তাহ'লে তুমি অসংকোচ গৌরবে স্বীকার করতে যে তুমি আমাকেই ভালোবাসো, ভালোবাসো, নিশ্চয়ই ভালোবাসো···'বলতে-বলতে নিরঞ্জন একটা চেয়ারের উপর এলিয়ে পড়লো।

'প্রতিবাদ ক'রে যখন কোনো লাভ নেই', উমা আরম্ভ করলো, কিন্তু সেই মুহূর্তে বেলা এসে ঢুকলো। নিরঞ্জন চটপট চুলগুলোর উপর একবার হাত বুলিয়ে, পাঞ্জাবিটা একটু টান ক'রে, মুখ-চোখের চেহারা ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বেগ যথাসাধ্য স্বাভাবিক ক'রে ভদ্রলোক সাজলো। ওর চেষ্টায় যে কোনো ফল হ'তেই হবে, তা নয় ; তবু চেষ্টা করতে দোষ নেই।

বেলা জিগেস করলো, 'আপনার চা এ-ঘরেই আনবো, না পাশের ঘরে যাবেন ?'

উমা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আর সাত মিনিটের মধ্যে আমার কাছে যুগ-বাণী প্রকাশালয় থেকে এক ভদ্রলোক আসবেন। বেলা, জবাহরলালের সেই জীবনীর পাণ্ডুলিপিটা সংশোধন করে রেখেছো ? বেশ। আমি নিজেও একবার দেখে দিচ্ছি।'—উমা ইজি-চেয়ার ছেড়ে উঠলো—'নিরঞ্জন, তুম পাশের ঘরে গিয়েই চা খাও।'

*　　　*　　　*

'একখানা শিঙাড়া খেয়ে দেখবেন না ?' বেলা বললো, 'ভিতরে মাংস আছে।'

নিরঞ্জন ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বললো, 'খাচ্ছি, খাচ্ছি।' ব'লে এক টুকরো কচুরি ভেঙে মুখে দিলো। যদিও খেতে তার একটুও ইচ্ছা করছিলো না। কিন্তু না-খেলে বেলা হয়তো অপরাধ নেবে। কিসে এবং কখন যে লোকে অপরাধ নেয় নিরঞ্জনের সে-বিষয়ে খুব অস্পষ্ট ধারণা, কিন্তু এটুকু সে বোঝে যে সংসারে—ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাদের মধ্যে কথায়-কথায় অপরাধ নেবার রীতি আছে। নিরঞ্জন কোনোকালেও পুরোদস্তুর ভদ্রলোক হ'য়ে উঠতে পারেনি, বহু চেষ্টা করেও না। তার ম্যানার্স নাকি রীতিমতো

শোচনীয়—সবাই তা-ই বলে—কখন এবং কোথায় কী করতে এবং বলতে হয়, এবং—যা জানা আরো বেশি দরকার—কী না-করতে এবং না-বলতে হয়, নিরঞ্জন তা কিছুতেই মনে রাখতে পারে না। শর্বরীর সব উপদেশ মাঠে মারা যায়। নিরঞ্জনের, তাই, নিজের জন্য ভয়ের সীমা নেই ; কোনো পার্টিতে গেলে ভয়ে-ভয়ে ও চুপ ক'রেই থাকে। ভাগ্যিশ থাকে। নিরঞ্জন রায়ের একবার মুখ ছুটলে আর কার সাধ্যি কথা বলে—হোক সে সুকুমার সেন, যে রসিকতা ফেরি ক'রে বেড়ায় ; হোক সে অমিতা চন্দ—Pretty আর witty অমিতা চন্দ, ফুরফুরে মেয়ে, ঝকঝকে মেয়ে অমিতা চন্দ—যে-মেয়ের মতো আমাদের মধ্যে আর-কেউ নয়, কেউ নয় ; হোক সে অতনু মিত্র, অ্যাপোলোর মতো যার চেহারা, যার কালো চোখ আলস্যে আর বাসনায় মদির, যাকে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারে, এমন মেয়ে বাংলা দেশে কেউ নেই—অবশ্য অমিতা চন্দ ছাড়া ; হোক সে সাবিত্রী বোস, সোনার ঘণ্টার মতো যার চুল মাথার দু'দিক দিয়ে নেমে এসেছে, রুপোর ঘণ্টার মতো বেজে ওঠে যার গলার স্বর। নিরঞ্জন যখন কথা বলতে থাকে, সবাই হতভম্ব হ'য়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, যতক্ষণ চীৎকার করতে গিয়ে ওর গলা না-ভেঙে যায়, একটা সোফার উপর স্তূপ হ'য়ে ভেঙে প'ড়ে ও হাঁপাতে না থাকে।

কিন্তু এ-রকম ঘটনা সচরাচর নয়; নিরঞ্জন সাবধান থাকে। কিন্তু যখন হয়, পরে ওর অনুতাপের সীমা থাকে না; পরে ওর বিনয়ের আতিশয্যে সবাই অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে। ও কেলেঙ্কারি করেছে; এ অপরাধ ওর ক্ষমা করা হোক; বাকি জন্মের মতোও একেবারে লক্ষ্মী ছেলে হ'য়ে থাকবে। আর সেই ক্ষমা অর্জন করবার জন্যে নিজেকে ও এত মৃদু, এত ছোটো ক'রে ফেলে যে তখন ওকে দিয়ে আপনি যা খুশি তা-ই করিয়ে নিতে পারেন। এখন, যেমন বেলা ওকে শিঙাড়া খাওয়াচ্ছে। উমার সঙ্গে এইমাত্র ওর যে-বাচনিক মল্লযুদ্ধ হ'য়ে গেলো, তার ফলে নিজেকে নিয়ে ও এখন বেজায় সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়েছে: কখন কী অভদ্রতা ক'রে ফেলে, সে-ভয়ে চেয়ারটায় আরাম ক'রে বসতেও পারছে না; চামচে দিয়ে চা-টা নাড়বার আগে দু'মিনিট ভাবছে—এটা ওর উচিত হচ্ছে কিনা। সেই ভয়েই ও শিঙাড়া খাচ্ছে—যদিও খাবার ইচ্ছে ওর একবিন্দুও নেই।

কিন্তু কেন ও নিজেকে একেবারেই সামলাতে পারে না? কখনো কোথাও নয়? সামান্য ব্যাপারেই কেন জ্ব'লে ওঠে, একটুতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে? লোকের উপহাস—এবং যা আরো খারাপ—করুণা সহ্য ক'রে? অন্য লোকের কাছে যেমন-তেমন, কিন্তু উমার কাছে এসে এ-রকম

উচ্ছ্বাস অমার্জনীয়, অমার্জনীয়। এ-সব সময়ে উমার চোখে ওকে কেমন দেখায়, নিরঞ্জন তা কল্পনা করতে চেষ্টা করলো।…না, উমা ওকে সং সাজায়নি ; নিরঞ্জন নিজেই ওর সে-পরিশ্রম বাঁচিয়েছে। ভুল, ভুল ; নিরঞ্জনের সব কথা ভুল। উমা কোনোকালেও ওকে ভালবাসবে না। উমা ঠিক বলেছে ; কী ক'রে উমা ওকে ভালোবাসতে পারে ? ও দুর্বল, দুর্বল। ও হীন, তুচ্ছ, অবিবেচ্য। ওকে চোখেই পড়ে না। ওকে চেষ্টা করলেও আমলে আনা যায় না। নিরঞ্জন, তুমি আর বাইরে মুখ দেখিয়ো না ; নিজের ঘরে বন্ধ হ'য়ে প'ড়ে থাকো, বাকি জন্মের মতো অপরিচয়ের অন্ধকার হোক তোমার আচ্ছাদন।

'আপনার চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।'

'ঠাণ্ডা ? না, না, মোটেও না।' নিরঞ্জন হঠাৎ অথই জলে প'ড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলো। এক চুমুকে পেয়ালার বাকি চা-টা শেষ ক'রে আবার বললো, 'মোটেও তো ঠাণ্ডা হয়নি, মোটেও না।'

'চা-টা খাবার মতো হয়েছে কি ?'

'চমৎকার হয়েছে, চমৎকার। এত ভালো চা আমি বেশি খাইনি। আপনাকে অনেক আগেই বলা উচিত ছিলো, কিন্তু কখন কী বলতে হয়, আমি কিছুতেই মনে

করতে পারিনে। রীতিমতো শোচনীয় ম্যানার্স আমার। ক্ষমা করবেন।'

নিরঞ্জন বেলার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলো, তার মুখ অন্য দিকে ফেরানো। নিরঞ্জন উশখুশ করতে লাগলো। ওর কথাগুলো কি তাহ'লে বেলা শোনেনি? কিন্তু শুনেছে নিশ্চয়ই, নয়তো একটু পরে নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে সে জিগেস করবে কেন—'আর-এক পেয়ালা দেবো?'

'নিশ্চয়ই—মানে, যদি কোনো অসুবিধে না হয়, যদি—' হঠাৎ শারীরিক যন্ত্রণার মতো একটা কথা তা'র মনে ফিরে' এলো। রুদ্ধশ্বাসে সে বলতে লাগলো, 'আমার বিলেতি ভদ্রতার বুকনিগুলো ক্ষমা করবেন, আমি কিন্তু ভদ্রতা ক'রে বলি না, মন থেকেই বলি, কিন্তু লোকে মনে করে—' কথা, শেষ না-ক'রে নিরঞ্জন হতাশ ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিলে।

বেলা নীরবে নিরঞ্জনের খালি পেয়ালা ভরতি ক'রে দিলে।

হঠাৎ নিরঞ্জন বললো, 'আপনি চা খাচ্ছেন না যে?— এটাও আমার অনেক আগে জিগেস করা উচিত ছিলো— তা-ই নয়? না জানি আপনি আমাকে কী ভাবছেন।'

বেলা চায়ে দুধ আর চিনি মিশিয়ে বললো, 'আমি

আগেই খেয়েছি। চা-টা কি খুব বেশি কড়া হ'য়ে গেলো। আরো দুধ দরকার হবে? চিনি?'

নিরঞ্জন চায়ে চুমুক দিয়েই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো: 'ঠিকই হয়েছে। চা আমি কড়া ক'রেই খাই—খুব কড়া। ঠিকই হয়েছে; দুধ চিনি কিচ্ছু দরকার নেই। চমৎকার চা। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমার প্রতি আপনার এত দয়া!'

ব'লে নিরঞ্জন বেলার দিকে তাকালো; কিন্তু বেলার মুখ তখন অন্য দিকে ফেরানো। নিছক ভদ্রতা;—নিরঞ্জন ভাবতে লাগলো—কিন্তু ভদ্রতাও কত সুন্দর হয়, কত মধুর। হ্যাঁ, মধুর বইকি। শুধু মুখের কথাই তো খরচ হয়, মিষ্টি ক'রে বলা একটু কথা—তবু, মন তাতে খুশি হয়, হৃদয়কে তা স্পর্শ করে। নিরঞ্জন এমনিই অপদার্থ যে এই ভদ্রতা করতেও সে শেখেনি। বেলা যদি কখনো ওর বাড়ি যায়, তাহ'লে ও কখনোই তাকে এ-রকম আপ্যায়ন করতে পারবে না; হয়তো চা খাওয়াতেই ভুলে' যাবে; হয়তো নিজেই সারাক্ষণ কথা বলতে থাকবে। চেয়ারের হাতলে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে-দিতে সে বার-বার মাথা নাড়লো। না, তাকে দিয়ে কিছু হবে না। কিছু হবে না। এক যদি নাটক লেখা হয়। নাটক ও লিখবেই, এমনি একটা প্রতিজ্ঞা না ওর মনে ছিলো?

আজ সকালেই না ও মনে-মনে ভাবছিলো—উমার যা হয় হোক, নাটক ও লিখবেই, সাহিত্য নিয়েই ওর জীবন? বাজে, বাজে, বাজে কথা। নিরঞ্জন রায় আবার লিখবে! মেয়ের ভালোবাসা পাবার যোগ্যতা যার নেই, সে আবার লিখবে! এমন অসম্ভব স্পর্ধা কী ক'রে তার হ'তে পেরেছিলো? নিরঞ্জনের চোখের সামনে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়ে যেতে-যেতে একটিমাত্র সত্যে এসে ঠেকলো। কেন মানুষ টাকা রোজগার করে, বই লেখে, কলকব্জা বানায়, ছুটোছুটি, কথা-কাটাকাটি করে—আসলে, যখন, মানুষকে যা বাঁচিয়ে রাখে, তা ভালোবাসা, তা ছাড়া আর-কিছুই নয়? কেন এত সভা-সমিতি, কেন এরোপ্লেন আর রেডিও, খুনোখুনি আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বর্নার্ড শ আর জি. কে. চেস্টরটন, যখন এক ভালোবাসা ছাড়া কিছুতেই কিছু এসে যায় না? ভালো-বাসবে—এবং ভালোবাসা পাবে, এ-ই কেন মানুষের জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য নয়? কারণ, তাহ'লেই সব জিনিশেরই মানে হয়; আর, তা না হ'লে কিছুরই কোনো মানে হয় না কেন মানুষ অন্য-সব কাজ, অন্য-সব চিন্তার আগে, এরই চেষ্টা করে না—ভালোবাসতে আর ভালোবাসা পেতে? কেন অনর্থক এই হৈ-চৈ, এই ভিড়-ঠেলে চলা, মাথায়-মাথায় ঠোকাঠুকি, পয়সার জন্য, যশের

জন্য কাড়াকাড়ি, ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে দেশের লোকের হাতে মার খাওয়া? কিন্তু ভালোবাসা তো চেষ্টা ক'রে পাওয়া যায় না,—ভালোবাসা আসে, আসে আকাশ থেকে, স্বর্গ থেকে, মানুষের সমস্ত দুঃখের উপর বিধাতার আশীর্বাদের মতো। নিশ্চয়ই সব মানুষই কখনো কারো-না-কারো ভালোবাসা পায়, নয়তো মানুষ বেঁচে থাকে কেমন ক'রে?...

হঠাৎ নিরঞ্জন বেলাকে জিগেস করলো, 'আপনি কাকে ভালোবাসেন?' সঙ্গে-সঙ্গে কপাল থেকে গলা পর্য্যন্ত লাল হ'য়ে উঠে বেলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। 'Shy! Shy! Shy!'—শ-র নায়কের সেই গভীর নৈরাশ্য আবার নিরঞ্জনের মনে কথা ক'য়ে উঠলো: 'All the love in the world is longing to speak; —only it dare not, because it is shy! shy! shy!' লজ্জা; নিদারুণ, নিষ্ঠুর লজ্জা; ম'রে গেলেও কেউ স্বীকার করবে না—পারতপক্ষে, নিজের কাছেও না। কোনো জিনিশই নিরঞ্জনের চোখে পড়ে না—উমা ঠিকই বলেছে; কিন্তু ওর প্রবৃত্তির অসাধারণ প্রখরতা ও নিজেই অনুভব করে (আর, সেই জন্যেই তো ওর বিশ্বাস করবার সাহস হয়েছিলো যে নাটক লেখা ওর হবে), আর প্রবৃত্তির কখনো ভুল হয় না; তাই বেলার লজ্জায় লাল

মুখের দিকে একবার তাকিয়েই ও বুঝতে পেরেছে—জানতে পেরেছে যে বেলা ভালোবাসে। বেলাও ওর মতো একজন; তাই বেলা ওকে বুঝতে পারে, তাই ওর প্রতি বেলার অত দয়া; বেলার ভদ্রতা নিছক ভদ্রতা নয়, তার আড়ালে সমবেদনা আছে। নিরঞ্জনের পক্ষে এটা একটা প্রকাণ্ড আবিষ্কার; নিরঞ্জন আনন্দে হেসে উঠলো। সেই হাসির শব্দ বেলার অতি দীর্ঘ কুমারী-জীবনের সহস্র নিয়ম-কানুনের শক্ত বাঁধনকে মুহূর্তের জন্য ঢিলে ক'রে দিয়ে গেলো। মুহূর্তের জন্য ও জ্বলে' উঠলো। '—হাসছেন?'

নিরঞ্জনের প্রখর প্রবৃত্তি ওকে আবার সাহায্য করলো। 'হাসছি, কিন্তু আপনাকে ঠাট্টা ক'রে নয়; অভিনন্দন ক'রে। আপনি তো জানেন না যে আমাকেই পৃথিবীর সব লোক ঠাট্টা করে, কাউকে ঠাট্টা করবার ক্ষমতা আমার নেই।'

মুহূর্তের জন্য বেলা জ্বলে' উঠেছিলো; সে-মুহূর্ত ফুরিয়েছে; এখন সে পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু ওকে দরজার দিকে এগোতে দেখেই নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। পাঞ্জাবির পকেটসুদ্ধ হাত দুটো পিছনে টেনে নিয়ে একত্র ক'রে বেলার মুখের দিকে একটু ঝুঁকে প'ড়ে ও অন্তরঙ্গ-ভাবে বলতে লাগলো,

'আমার কাছে লজ্জা করবেন না, আমিও আপনার মতোই একজন। সেই জন্যই তো আমার কাছ থেকে আপনি লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। কী ক'রেই বা পারবেন? আমি একেবারেই অপদার্থ, কিন্তু কতগুলো জিনিশ আমি ঠিক বুঝি। জানেন না, এই মুহূর্তে আপনাকে পেয়ে আমার কত ভালো লাগছে। এতক্ষণ আমার ভীষণ মন-খারাপ ছিলো—কেন, তা তো আপনি জানেনই। উমা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, করছে বহুদিন ধ'রেই, কিন্তু আজ প্রথম ওর মুখ থেকে স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান শুনলাম। ওর কাছে তাড়া খেয়ে আমি ছিটকে পড়ছিলাম, আপনি দিলেন আশ্রয়। উমা কাজের লোক, আমার কথা শোনবার সময় ওর নেই, ভালোবেসে ও সময়ের আর উৎসাহের বাজে খরচ করতে চায় না। আমি ওর উপহাসের পাত্র, শুধু ওর নয়—সমস্ত পৃথিবীর; কারণ, পৃথিবীর সব লোক উমার মতো ব্যস্ত, উমার মতো কপট। আমার প্রচুর অবসর নিয়ে আমি একা-একা ঘুরে বেড়াই, কেউ আমাকে আমল দেয় না। এক-এক সময় ওদের তুলনায় নিজেকে এত ছোটো, এত নগণ্য মনে হয় যে ম'রে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, এই পৃথিবীতে আমার না-জন্মালেই ভালো ছিলো।...এমনি মন নিয়ে আমি ব'সে ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক শুভ

মুহূর্তে আপনি আমার কাছে নিজেকে উদ্ঘাটিত করলেন, আপনার মধ্যে আমি নিজেকে দেখলাম; দেখলাম, পৃথিবীতে আমি একেবারে একা নই। আমি একা নই; এই আনন্দেই তো তখন আমি হেসে উঠেছিলাম।... আপনাকে—'নিরঞ্জনের মুখে বিজয়ের গর্বিত হাসি ফুটে উঠলো; আরো দ্রুত, আরো প্রবল স্বরে সে ব'লে যেতে লাগলো, 'আপনাকে আমি ধ'রে ফেলেছি, এখন আর আমার কাছ থেকে আপনি কিছুই গোপন করতে পারবেন না। বরং বলুন—সব বলুন, তাতে আপনারও ভালো হবে। কে সে? কেমন দেখতে? কেমন তার কথা? কবে তাকে প্রথম দেখেছিলেন? সব বলুন, আমার মতো ভালো শ্রোতা আর পাবেন না।' নিরঞ্জন থামলো, কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে সে অত্যন্ত মৃদুস্বরে, প্রায় কানে-কানে বলার মতো ক'রে বললে, 'আপনার অদৃষ্ট হয়তো আমার চাইতে ভালো; আপনি হয়তো তার ভালোবাসা ফিরে পেয়েছেন? কিম্বা হয়তো সে আপনার দিকে ফিরেও তাকায় না, আপনার দুর্ভাগ্য হয়তো আমার চেয়েও বড়ো? কিন্তু যা-ই হোক না কেন—'

বেলার মুখের উপর চোখ পড়তেই নিরঞ্জন বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। বেলার মুখ কাগজের মতো শাদা,

তার চোখ বোজা, তার নিচের ঠোঁট থরথর ক'রে কাঁপছে; কী হ'লো এর মধ্যে?...হঠাৎ নিরঞ্জন যেন চাবুকের বাড়ি খেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলো, দু'হাত মোচ্ড়াতে-মোচ্ড়াতে আর্তস্বরে বলতে লাগলো, 'ক্ষমা করবেন, ক্ষমা করবেন, আমি একেবারে ভুলে' গিয়েছিলাম!' হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে সে আঙুলের গাঁটগুলো মাথার দু'পাশে ঠুকতে লাগলো—'আমি ভুলে' গিয়েছিলাম যে ভদ্রসমাজে কেউ কাউকে এ-সব কথা জিগেস করে না—মানে, ততখানি আলাপ আপনার সঙ্গে আমার নেই। খুবই অন্যায় হ'য়ে গেছে আমার। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ আমি ইচ্ছে ক'রে করিনি; আমি একেবারে ভুলে' গিয়েছিলাম—সব কথাই আমি ভুলে' যাই। কেন আপনি আমাকে আগেই থামিয়ে দিলেন না? কেন মনে করিয়ে দিলেন না আমাকে? ছী-ছি—আমি কী বোকা! আমি কী বোকা! বলুন, আপনি কি কখনো আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন না?' নিরঞ্জন নিজের মাথার চুলগুলো ধ'রে পাগলের মতো টানতে লাগলো।

হাজার হ'লেও, বেলার রক্তমাংসেরই তো শরীর, এবং রক্তমাংসের সহ্য করতে পারার একটা সীমা আছে। নিরঞ্জনকে বিমূঢ় ক'রে দিয়ে বেলা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু দরজার কাছে বাধা পেলো

উমাকে। নিমেষে বেলার সমস্ত রক্তমাংস পাথর হ'য়ে গেলো।

'কী হয়েছে, বেলা?' উমা একবার বেলার, একবার নিরঞ্জনের মুখে তাকিয়ে জিগেস করলো, 'তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?'

নিরঞ্জন নতমুখে অপরাধ স্বীকার করলো, 'আমি ওঁকে অপমান করেছি।'

'অপমান করেছো?'—উমার মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠলো—'কী রকম?'

'আমি ওঁকে এমন-সব কথা বলেছি, যা কোনো ভদ্রলোকের কোনো ভদ্রমহিলাকে বলবার রীতি নেই। সেই জন্য উনি অপরাধ নিয়েছেন। আমি অবশ্য ক্ষমা চেয়েছি। তবে, উনি ক্ষমা করেছেন কিনা সন্দেহ। উমা, তুমি যদি আমার হ'য়ে ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলো—'

'তা-ই নাকি?' উমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি বেলার সমস্ত মুখ তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখলো, 'তা-ই নাকি, বেলা?...হবেও বা; নিরঞ্জনের তো আবার কাণ্ডজ্ঞান নেই। কিন্তু, আশা করি, বেলা, তুমি ওকে বেশ যত্ন ক'রেই চা খাইয়েছো। আশা করি, বেলা, ওর এ-সামান্য ত্রুটি তুমি গায়ে মাখোনি। ওর প্রতি যে অসীম দয়া তোমার।'

নিরঞ্জন গাঢ়স্বরে বলতে লাগলো, 'সত্যি অসীম দয়া। উমা, আমি যখন—'

উমা ওর কথা কেটে দিয়ে বললো (হঠাৎ ওর গলার আওয়াজ সজীব, উৎফুল্ল—এমন কি, লঘু হ'য়ে উঠ্‌লো ; নিরঞ্জন তার মধ্যে সেই পুরানো সূক্ষ্ম মীড় শুনতে পেলো)—উমা বললো, 'চলো নিরঞ্জন, একটা ট্যাক্সি নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি ; চলো।' নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে মধুর করে হাসলো উমা,—'আর, ছাখো বেলা', উমা ওর শুষ্ক সরকারি ভাষায় বললো, 'গেলো মাসের আয়-ব্যয়ের হিশেবটা কাল সমিতিতে দাখিল করতে হবে। একটা খশড়া ক'রে রেখো—আমি ফিরে এসে দেখবো।'

বেলা মিলিয়ে গেলো। নিরঞ্জন আর উমা দরজার দিকে এগোচ্ছে। উমা ঠোঁটের এক কোণে হাসছে, প্রায়ই ও যেমন ক'রে হাসে—তবু এখনকার হাসি যেন একটু আলাদা। আর নিরঞ্জন—নিরঞ্জনের বুকের মধ্যে তোলপাড় চলছে ; সেখানে প্রত্যেক হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে একটি গান বেজে উঠছে : 'আমি সুখী ! আমি সুখী ! আমার মতো সুখী পৃথিবীতে আর-কেউ নয়।'

দৃশ্যটি সুন্দর ; সুতরাং এখানেই যবনিকা টানা যাক।

৪

দৃশ্য-পরিবর্তনে যেটুকু দেরি হ'লো, তাতে ওদের ট্যাক্সি অনেকদূর এগিয়ে গেছে। হ্যারিসন রোডের মোড়ে ওদের ধরা গেলো। কেননা, ওদের ট্যাক্সি সেখানে এসে থামতে বাধ্য হয়েছে—নইলে শেয়ালদা থেকে হাওড়ার দিকে আর হাওড়া থেকে শেয়ালদার দিকে বিপুল ট্র্যাফিকের স্রোত অনায়াসে চলাফেরা করবে কী ক'রে? পুলিশের সর্বশক্তিমান বাহু আনত হ'লো; হ্যারিসন রোডের দু'দিকে স্তূপীকৃত ট্র্যাফিক্ দুলে উঠলো একসঙ্গে; ওদের ট্যাক্সি কলেজ স্ট্রীট দিয়ে হু-হু ক'রে ছুটতে লাগলো। নিরঞ্জন তখন কবিতা আবৃত্তি করছে।

যখনই ওর মন খুব ভালো লাগে, নিরঞ্জন কবিতা আবৃত্তি করে। অবশ্য ওর আবৃত্তি শুনে কেউ বুঝতে পারে না; ওর মুখ থেকে শুনলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতাও আপনার কাছে অর্থহীন কিচিরমিচির মনে হবে। তা হোক—ও তো আর লোককে শোনাবার জন্য কবিতা আওড়ায় না, লোকে না-বুঝলে ওর ভারি তো ব'য়ে গেলো! লোককে শোনাতে ও চায়ও না—তাই এত মৃদুস্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করে যে—এখনকার কথাই ধরুন—ওর আধ হাত দূরে ব'সেও উমা শুধু একটা

অস্পষ্ট গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে। উমা অবশ্য জানে, কী ব্যাপার। ভালোই, নিরঞ্জন যত খুশি পদ্য আওড়াতে থাক, উমার অনেক কথা ভাববার আছে। ওদের কলেজ-পিকেটিং-এ বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না; ছেলেদের সহানুভূতি নেই, মেয়েদের তো আরো নেই। ভলান্টিয়ারি করতে যারা আসছে, তারা সব পাড়াগেঁয়ে ভূত—কিচ্ছু বোঝে না, কিচ্ছু জানে না, শুধু অর্থহীন চীৎকার করতে পারে। হোক সে-চীৎকার বন্দে মাতরম!—অর্থহীনতা তাতে ক'মে যায় না। জীবনে কোনাদিকেই যাদের কিছু হবার আশা আর নেই, তারাই দেশ-সেবা করতে আসে—অনেক স্বেচ্ছা-সেবিকাকে দেখেও উমার এ-কথা মনে হয়;—উমার পক্ষে তা যতই অনুচিত হোক, তবু হয়। খারাপ চেহারা নিয়ে নালিশ করার অবশ্য কোনো মানে হয় না—কিন্তু, উমার প্রায়ই মনে হয়, ওদের দলে ভালো চেহারার মেয়ে এত কম কেন? সহজ উত্তর: ভালো চেহারার মেয়েরা ভালো বিয়ের আশা রাখে, তাই তারা ইস্কুল-কলেজ ছাড়তে চায় না, যাদের জীবনে আলো আছে, আশা আছে, আনন্দ আছে, তারা তাদের অভ্যস্ত পরিমণ্ডল ছাড়বে কেন? যারা 'স্বদেশি'তে আসে, ও-সব সুবিধে পায় না ব'লেই আসে। আর আসে, জীবনে যারা ব্যর্থ হয়েছে। প্রৌঢ়া—এমন কি, বৃদ্ধা সব মহিলা।

নিরাশ্রয়, নিষ্প্রাণ বিধবা। কিংবা স্বামী-পরিত্যক্তা। না হয়, স্বামী যাদের উন্মাদ কি চিররুগ্ন কি পঙ্গু। কেউ চরকার সুতো বেচে স্বামীপুত্র নিয়ে কায়ক্লেশে দিন চালায়। অনেক বয়স্কা ধর্মের বদলে 'স্বদেশি'কে আঁকড়ে ধরেছেন—দেশের দুঃখ দূর করবার জন্য নয়, নিজেদের জীবনের অসহ্য শূন্যতা ভ'রে তোলবার জন্য। দেশের জন্য সত্যি অনুভব করে, সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকা-বাহিনীর মধ্যে এমন ক'জন আছে? জীবনটা সুখে-দুঃখে কোনোরকমে কাটিয়ে দিতে হ'লে যে-সামান্য যোগ্যতা দরকার হয়, তা-ও যাদের নেই, তারা করবে দেশ স্বাধীন? না—গভীর দুঃখে উমা ভাবতে লাগলো—কোনো আশা নেই, কোনো আশা নেই। কিছু হবে না—যতক্ষণ দেশের ভালো-ভালো লোকদের না পাওয়া যায়। অমন যে-ক'জন এসেছেন, সবাই নেতৃস্থানীয়। কিন্তু কাজ যাদের দিয়ে করাতে হ'চ্ছে তারা···তাদের কথা, না বলাই ভালো।

বৌবাজারের মোড়ে এসে ট্যাক্সি ডানদিকে মোড় ফিরলো। নিরঞ্জন তখন আবৃত্তি করছে:

Had we but world enough, and time,
This coyness, lady, were no crime.
We would sit down, and think which way
To walk and pass our long love's day···

—তাদের কথা না-বলাই ভালো, অথচ তাদেরই উপর নির্ভর করছে সব। নেতা আর ক'জন দরকার? যাদের নিয়ে 'সেনাবাহিনী', তাদের মধ্যে বুদ্ধিমান, সবল, সুস্থ লোক না-এলে কিছুতেই কিছু হবে না। সেইজন্যই তো কলেজে কিছুদিন দারুণ পিকেটিং চালানো দরকার, যদিই বা দু'একজনকে পাওয়া যায়। দু' একজন! দু' একজনে কী হবে? তবু···। চেষ্টা করতে দোষ কী? কাল শহরের সবগুলো কলেজ আক্রমণ করতে হবে। লোক দরকার। কংগ্রেসের সবগুলো শাখা-কমিটিতে আজ রাত্রেই খবর পাঠাতে হবে—যেখানে যত লোক আছে, সব যেন পাঠানো হয়।···

But at my back I always hear
Time's winged chariot hurrying near :
And yonder all before us lie
Deserts of vast eternity.

উমার তীক্ষ্ণ হুকুম এলো : 'রোক্‌খে।'

সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউতে ঢুকেই ট্যাক্সি থেমে গেলো। আর থামলো নিরঞ্জনের আবৃত্তি।

উমা দ্রুতস্বরে বললো, 'দুঃখিত, নিরঞ্জন, কিন্তু তোমাকে এখানেই নামিয়ে দিতে হ'চ্ছে। এক্ষুনি আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে, জরুরি কাজ। যাও।' হতবুদ্ধি

নিরঞ্জনকে উমা একরকম ধাক্কা দিয়েই রাস্তায় নামিয়ে দিলো।—'চালাও—জোরসে।' গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে বোঁ ক'রে বেরিয়ে গেলো—সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ দিয়ে সোজা উত্তর দিকে। নিরঞ্জন শূন্যদৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

পাথরের মতো ভারি মন নিয়ে পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠলো। কাল এক সন্ধ্যার মধ্যে উমা ওকে কম নাকানিচুবুনি খাওয়ায়নি; নিমেষে স্বর্গে তুলেছে, পরের মুহূর্তেই একেবারে পাতালে—আবার সেই ধাক্কা সামলাতে-না-সামলাতেই এক হ্যাঁচকা টানে স্বর্গে। এমনি। কিছুই বোঝা যায় না। যায় না? খুব যায়। জলের মতো সোজা। অত সোজা ব'লেই হঠাৎ খটকা লাগে। ওর বন্ধুরা—'সুকুমার সেন যাদের প্রতিনিধি'—তারা কবে থেকেই তো বলছে। আবার চোখ বুজে' নিজের উপর অপার করুণায় ও ডাকতে লাগলো, 'নিরঞ্জন, নিরঞ্জন।' মনে-মনে বলতে লাগলো, 'নিরঞ্জন, তুমি স'রে পড়ো, ভুলে' যাও। অনেক হয়েছে, নিরঞ্জন, আর নয়। নিজের মন নিয়ে তুমি একলা থাকো; কারো কাছে যেয়ো না, কেউ তোমাকে চায় না, নিরঞ্জন।' আত্ম-করুণার উচ্ছ্বাসে সকালটা ওর এক রকম কেটে গেলো। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিজেকে করুণা করবার ক্ষীণ পরিতৃপ্তিটুকু

আর রইলো না ; ওর মনের সব ফেনা ঝরে গেলো ; কিছুতেই আর নিজেকে সুইনবর্ন-এর একটি কবিতার মতো ক'রে তুলতে পারলো না। সকালবেলা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ও বার-বার আবৃত্তি করেছে :

'Let us go hence and rest ; she will not love.
She shall not hear us if we sing hereof,
Nor see love's ways, how sore they are and steep.
Come hence, let be, lie still ; it is enough.
Love is a barren sea, bitter and deep ;
And though she saw all heaven in flower above, she would not love.

সাধারণত, মন ভালো থাকলেই সে কবিতা আওড়ায়, কিন্তু তখন সুইনবর্ন-এর এই বিষণ্ণ সুর ক্লোরোফর্মের মতো আচ্ছন্ন করেছিলো তাকে। অন্য-লোকের লেখা আওড়াচ্ছে না—সে যেন নিজেই কথা ব'লে যাচ্ছে ;—তার মনের অবস্থা এই রকম পরিষ্কার, অবিকল ক'রে সে নিজে কখনো বলতে পারতো না। তখনকার মতো, এই কবিতার সঙ্গে নিরঞ্জন এক হ'য়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু এখন—দুপুরবেলা—সে-নেশা অনেকটা কেটে

গেছে। বিষাদ দূর হ'য়ে এখন এসেছে ক্লান্তি—কিছুই-ভালো-না-লাগা ভাব। নিরঞ্জনের এ-ভাব খুব কম হয়, কিন্তু যখনই হয়, তখনি ও কতগুলি নতুন বই কেনে। কারণ, এমন মুহূর্ত ওর জীবনে আসা অসম্ভব, যখন নতুন কয়েকখানা বই ওর হাতে এলে ওর মন একটুও খুশি হ'য়ে উঠবে না—সে যতই না কেন ক্লান্ত হোক। বইগুলো দেখতে ওর ভালো লাগে, ছুঁতে ভালো লাগে, নতুন কাগজের গন্ধ শুঁকতে ভালো লাগে; বইগুলো ওর—এ-কথা ভাবতে ভালো লাগে। ক্লান্তির বিরুদ্ধে ওর এ-অস্ত্র কখনো ব্যর্থ হয় না, তাই প্রয়োগ করতেও কখনো ভুল হয় না। এখনো হ'লো না। দুপুরের রোদ ওর সয় না, তবু ও টাকা নিয়ে বেরুলো—বই কিনতে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের দরজায় ভিড় জমেছে—পিকেটিং হ'চ্ছে। নিরঞ্জন বাস-এর ঐ দিকটাতেই বসেছিলো ব'লে হোক, কি নিছক উদাসীনতা থেকেই হোক ও-দিকে একবার না-তাকিয়ে পারলো না। একদল মেয়ে কলেজের গেট আগলে রয়েছে—তাদের মধ্যে উমা; মুহূর্তে নিরঞ্জনের মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেলো। কোথায় গেলো তার ক্লান্তি, কোথায় গেলো বিষাদ! উমা পিকেটিং করে ব'লেই ও জানতো, কিন্তু চোখে এর আগে কখনো

ছাখেনি। উত্তেজিত-ভাবে তাড়াতাড়ি বাস থেকে নামতে গিয়ে ও পড়তে-পড়তে নিজেকে সামলে নিলো। বেজায় ভিড় : ভলন্টিঅর, ছাত্র, পুলিশ, মজা-দেখনে-ওলা। নিরঞ্জন কী ক'রে যে ভিতরে ঢুকে গেলো, নিজেই বুঝতে পারলো না। উমা সবার আগে দাঁড়িয়ে হাত-জোড় ক'রে ছাত্রদের কী-সব বলছে। নিরঞ্জন চীৎকার ক'রে ডাকলো : 'উমা।'

মুহূর্তের জন্য উমার—এবং আরো অনেকের—চোখ নিরঞ্জনের উপর এসে পড়লো। উমা যে ওকে চেনে, এমন-কোনো লক্ষণ সে দেখলো না। আর-সব চোখ ওকে ভুলে' গিয়ে আগেকার মতো চার পাশে তাকাতে লাগলো। নিরঞ্জনের আবির্ভাবে কোথাও কোনো ছাপ পড়লো না ;—এক, উমার পিছনে দাঁড়ানো বেলার মুখের উপর ছাড়া। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বেলার মুখ প্রথমে লাল, পরে শাদা হ'য়ে উঠে তারপর স্বাভাবিক রঙে ফিরে এলো। কিন্তু অত লোকের মধ্যে কেউ তা লক্ষ্য করলো না।

পিকেটিং চলছে। ছাত্ররা কেউ বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, কেউ মজা-দেখনে-ওলাদের সঙ্গে জুটে যাচ্ছে, কেউ বা চুপ ক'রে অপেক্ষা করছে—ফশ ক'রে যদি এক ফাঁকে ঢুকে যেতে পারে। নবাগতরা অনেকেই তর্ক করছে—

কিন্তু সোনার মতো যে-মেয়ের গায়ের রং, আর মেঘের মতো যে-মেয়ের চুল, তার সঙ্গে কলেজের ছোকরারা তর্কে এঁটে উঠতে পারবে কেন? দু' মিনিটে তারা হার মেনে বসে। যে-ছেলেকে নিতান্তই বাগানো যায় না, উমা দু'বাহুর এক সুন্দর ভঙ্গিতে তার সমস্ত যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে বলে, 'মোট কথা, যেতে পারবেন না।' এ-চমৎকার যুক্তির চমৎকার উত্তর হতে পারে: 'যাবোই।' কিন্তু ষোলো থেকে কুড়ির মধ্যে যে-ছেলেদের বয়স, উমা দেবীর মুখের উপর যে ও-কথা বলা যেতে পারে, তা তারা ভাবতে পারে না। আসল কথা এ-ই; যদিও এ-প্রসঙ্গে 'বিদ্রোহীতে' লেখা হবে: 'উমা দেবীর অকাট্য যুক্তি-প্রয়োগের ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের চৈতন্যোদয় হইয়াছে। তাহারা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছে যে দেশের প্রতি তাহাদের কর্তব্য…' ইত্যাদি।

কুৎসিত, কুৎসিত, এক পাশে দাঁড়িয়ে নিরঞ্জন ভাবতে লাগলো, ব্যাপারটা আগাগোড়া কত যে কুৎসিত, উমা তা সত্যি বুঝতে পারছে না—এ-ও কি সম্ভব? এই উন্মুক্ত প্রকাশ্যতা, হাতুড়ে ডাক্তারের মতো ভিড়ের সামনে নিজেকে জাহির করা, ছেলেমানুষের মতো পথ-আগলে-দাঁড়িয়ে-থাকা, ইডিঅটের মতো তর্ক, যার শেষ কথা হচ্ছে 'মোট কথা, যেতে পারবেন না।'—মানুষের স্বাধীনতার

উপর এই অত্যাচার, যৌবনের ভাবপ্রবণতার অন্যায়-ভাবে সুবিধে নেয়া—কুৎসিত, কুৎসিত—এর কুশ্রীতা অসহ্য। কিন্তু কী করা যায়? উমা ওর দিকে একবারও তাকাচ্ছে না; এত লোকের মধ্যে নিরঞ্জনই বা কী ক'রে ওর কাছে এগিয়ে যেতে পারে? আর তা-ও, ওর হাত ধ'রে টেনে না নিয়ে এলে ও যে ওখান থেকে নড়বে, এমন তো মনে হচ্ছে না।···

হঠাৎ পিছনের সব লোক যেন ঠেলা খেয়ে একটা ঢেউয়ের মতো ভিতরে এসে পড়লো। দু' একটা চীৎকার শোনা গেলো, তারপর পলকে লোকগুলি সব চারদিকে ছিটকে পড়তে লাগলো; নিরঞ্জনের পাশে যারা ছিলো, তারা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। ঘেঁষাঘেঁষি, গোলমাল, হৈ-চৈ; নিরঞ্জনের এতক্ষণে মনে হলো, ব্যাপার কী?

সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর পেলো সে। শপাং ক'রে তার পিঠে এক চাবুকের বাড়ি পড়লো। যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠে নিরঞ্জন মুখ ফিরিয়ে দেখলো জনৈক জন বৃষভ তার সামনে দাঁড়িয়ে। রাগে আর রোদ্দুরে তার মুখ-চোখ টকটকে লাল, রাজশক্তির প্রতীক-স্বরূপ বেঁটে একটি চাবুক ভিড়ের মধ্যে সে যথেচ্ছ চালাচ্ছে।

নিরঞ্জন ভেবেছিলো, তার ঘুষিতে সাহেবের নাক বুঝি দেহ থেকে বিচ্ছিন্নই হ'য়ে গেলো ; কিন্তু একটু পরে সে দেখলো যে সাহেবের নাক তাঁর মুখমণ্ডলে তেমনি শোভা পাচ্ছে, এবং তার দু' হাত দু'জন পুলিশের দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ। পরে, থানার কয়েদখানায় ব'সে-ব'সে নিরঞ্জন ভেবেছে যে এক সেকণ্ড দেরি যদি তার না হ'তো, তাহ'লে সার্জেণ্ট সাহেবকে আর মুখ দেখাতে হ'তো না।

এরই মধ্যে 'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদক কী ক'রে যেন উমার কাছে এসে চুপি-চুপি বললেন, 'পুলিশ ভিড় ভাগিয়ে দিচ্ছে। ধর-পাকড় হ'তে পারে।' বিঃ-সঃ-সঃ একটু দূরে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, উমা কখন যে সেখানে গিয়ে উঠলো, অন্য মেয়েরাই বা কে কোথায় গেলো, কিছু বোঝা গেলো না। নিরঞ্জন ছাড়া পুলিশ আরো চারজনকে গ্রেপ্তার করলো ; তাদের মধ্যে একজন ভলণ্টিঅর, দুজন ছাত্র, আর-একজন রাস্তার লোক। নিরঞ্জন ভাবলো, ঐ ভলণ্টিঅরের সঙ্গে যদি ওকে এক ঘরে রাখা হয়, তাহ'লেই ও গিয়েছে।

* * *

নিরঞ্জনের অপরাধ, পুলিশের শান্তি-রক্ষা-রূপ কর্তব্যে বাধা দিতে চেষ্টা করা। নিরঞ্জন বললো যে হ্যাঁ, ঐ সার্জেণ্টকে সে ঘুষি তুলেছিলো, লাগেনি ব'লে অত্যন্ত দুঃখিত। কারণ, লাগলে, চাবুকের শোধ হ'য়ে যেতো —তুলনায় তা যত কমই হোক না।

হাকিম বললেন যে নিরঞ্জন যদি মিঃ গডার্ডের কাছে ক্ষমা চায় তাহ'লেই তিনি ওকে সামান্য কিছু জরিমানা ক'রে ছেড়ে দিতে পারেন।

কিন্তু নিরঞ্জন ক্ষমা চাইলো না, বরং এ-কথাই বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলো যে তারই একটা ক্ষমা পাওনা আছে রাজশক্তির প্রতিনিধির কাছে। হাকিম তার কথা কী বুঝলেন কে জানে, কিন্তু তাকে ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

কোর্টের বাইরে অবশ্য শর্বরী—আর বেলা। বেলা অনেক কথা বলবে ব'লে এসেছিলো, কিন্তু নিরঞ্জনকে দেখে ওর চোখ জলে ভ'রে উঠলো, এবং বেলার চোখে জল দেখে হঠাৎ নিরঞ্জনের চোখ ফেটে কান্না আসতে লাগলো। জেলখানায় ছ'মাস ;—শর্বরীর ছেলেমানুষ-দাদা জেলখানায় ছ'মাস কাটাবে। ছ' মাস তো দূরের কথা—সাত দিনের মধ্যেই নিরঞ্জন ম'রে যাবে ; ওর শরীর খারাপ, তায় ও একেবারে অকর্মণ্য, সারাজীবন ওর

আরামে, স্বাচ্ছন্দ্যে, বিলাসিতায় কেটেছে—জেলখানার কষ্ট ও কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না, কিছুতেই না। সাত দিনের মধ্যেই ম'রে যাবে ও, এতে ওর নিজের কোনো সন্দেহ নেই। মরতে ওর আপত্তি নেই—কিন্তু এত কষ্ট পেয়ে মরা! নিরঞ্জন জল-ভরা চোখে শর্বরীর দিকে তাকিয়ে রইলো, শর্বরীর গাল বেয়ে অকপটে জলের ফোঁটা পড়ছে। বেলা আছে মুখ ঘুরিয়ে। এমনি তিনজন। সময় অল্প, কোনো কথা বলা হ'লো না।···

খবর পেয়ে 'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদক সামনের সপ্তাহের জন্য লিখতে বসলেন: 'পাঠকগণ অবগত থাকিবেন যে কিছুদিন পূর্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে পিকেটিং সম্পর্কে যে-পাঁচজন যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় একজন। গত বৃহস্পতিবার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ——র এজলাসে তাঁহার ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। নিরঞ্জনবাবু ধনী ও সাহিত্যরসিক; কলিকাতার সাহিত্য-সমাজে তিনি সুপরিচিত। সাহিত্য-রসে মগ্ন হইয়াই তিনি জীবন-যাপন করিতেন; বহুদিন পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু আজ এই বাণী-কমলার বরপুত্র দেশের সেবায় হাসিমুখে কারাগার বরণ

করিয়া নিয়াছেন! তাঁহার এই স্বার্থত্যাগ, এই অপূর্ব দেশভক্তি, এই গৌরবময় অনুপ্রেরণা—' একটু ভেবে রিঃ-সঃ-সঃ বসিয়ে দিলেন,—'বর্ণনার অতীত!' সর্বান্তঃ-করণে তাঁহাকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি! এবং যাঁহার প্রভাবে শ্রীযুক্ত রায়ের মনে এই পরিবর্তন আসিয়াছে, সেই অক্লান্তা কর্মিণী, ভারতবর্ষের নারীদের আদর্শস্থানীয়া শ্রীযুক্তা উমা দেবীকে আমরা বলি, "ধন্য! ধন্য!"—কারণ তাঁহার অসংখ্য গৌরবময় কীর্তির মধ্যে নিরঞ্জনবাবুর এই পরিবর্তন-সাধনও তুচ্ছ নহে!'

*   *   *

নিরঞ্জন কিন্তু ছ'মাসেও ম'রে গেলো না; বরং একটু মোটাসোটা, গাল-ভরা হ'য়েই জেল থেকে বেরুলো।

বাইরে শর্বরী তার জন্য অপেক্ষা করছিলো—আর বেলা। নিরঞ্জন আশা—হ্যাঁ, আশাই করেছিলো যে উমাও থাকবে। কিন্তু উমাকে না-দেখে সে নিজেকে খুব বেশি দুঃখিত হ'তে দিলে না। উমার কত কাজ—ওর হয়তো সময় নেই, বা মনেই নেই। তা ছাড়া, নিরঞ্জনের কাছে না-হয় জেলে ছ' মাস কাটানো একটা ভীষণ

কীর্তি ; ও যে ম'রে যায়নি, এই জন্যই নিজের প্রতি ওর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কিন্তু উমার কাছে তো তা জল-ভাত ; ওর সাঙ্গোপাঙ্গোরা হামেশাই জেলে যাচ্ছে ; বেরুচ্ছে, আবার যাচ্ছে। জেলে যাওয়াতে যে কোনো কষ্ট আছে ; এমনকি, বিশেষত্ব আছে, উমার তা মনে হবার কথা নয়, কিন্তু নিরঞ্জনের কাছে—খোলা রাস্তায় শর্বরী আর বেলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও ভাবতে চেষ্টা করলো, এই ছ'মাস জেলখানার কয়েদি হ'য়ে ও কাটালো কী ক'রে ? উঃ, মানুষের জন্য মানুষ এত কষ্টের ব্যবস্থা করে ! কী খাওয়া—আর কী পোশাক, খদ্দরের চেয়েও সহস্রগুণে খারাপ। তবু তো জেলার-বাবুকে ব'লে-ক'য়ে মাথার চুলগুলো ও ভদ্রলোকের মতো ক'রেই ছাঁটাতে পারতো। আর কাজ—ওর শরীর দুর্বল ব'লে ওর কাজ ছিলো নারকোলের ছিবড়ে থেকে দড়ি বানানো—সেটাই নাকি সোজা। হে ঈশ্বর, এ-ই যদি সোজা হয়— ! তা ছাড়া, নিরঞ্জন political prisonerও নয়—নিতান্তই সাধারণ কয়েদি ; চোর, গুণ্ডা, গাঁট-কাটাদের দলের। সেই সব লোকের সঙ্গে রোজ ওর মেলামেশা ; না জানি ওর মন কত নোংরা হ'য়ে গেছে !

কিন্তু যাক ও-সব। নিরঞ্জন প্রবল মাথা-ঝাঁকুনি

দিলো—এখন আর দুঃখের চিন্তা কেন? আবার শর্বরী, ওর সেই বইয়ে-ঠাশা ঘর; আবার সিগারেট, আবার পরিষ্কার, নরম জামা-কাপড়, নরম বিছানা, ভালো খাওয়া; আবার সাহিত্যচর্চা, আবার জীবন। এইবার ওকে নাটক লিখতে হবে; ছ'টা মাস এমন বিশ্রী অপব্যয় হ'লো, আর সময় নষ্ট করা চলে না। লিখতে বসবে—এ-কথা মনে করতেই ওর পঁচিশ বছরের জীবনের সমস্ত আনন্দ, সমস্ত উৎসাহ যেন শারীরিক অনুভূতির মতো ওকে আপ্লুত ক'রে দিলো।…গাঢ় চোখে ও শর্বরীর দিকে তাকালো, পরে বেলার দিকে। জেলখানায় শর্বরী কি বেলা যখন ওকে দেখতে যেতো, ঐ কুৎসিত পোশাকে দেখা দিতে নিরঞ্জনের রীতিমত লজ্জাই করতো। উমা এই ছ'মাসে ওকে একদিনও দেখতে আসেনি—নিরঞ্জনের মনে পড়লো—আজ এলেও তো পারতো।

কিন্তু নিরঞ্জন এখনো জানে না যে উমা এই মুহূর্তে আছে পাবনাতে, কারণ সেখানকার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিসট্রেট হচ্ছে হিমাংশু গুহ, নিরঞ্জনের বন্ধু হিমাংশু, নিরঞ্জনের ব্রিলিঅণ্ট বন্ধু হিমাংশু, আই.-সি.-এস. হিমাংশু—হিমাংশু—বিলেত থেকে ফিরে আসা মাত্র উমা তাকে বিয়ে করেছে। অবশ্য এ-খবর শুনে ওর এই মুহূর্তের আনন্দ আরো বেড়ে যাবে; কারণ এতদিনে তো

উমা বুঝতে পেরেছে—পারেনি কি?—যে নিরঞ্জন আগাগোড়া যে-কথা বলেছিলো, সে-কথাই ঠিক; নিরঞ্জনের দাবি, প্রকৃতির দাবি না-মিটিয়ে যে ওর উপায় নেই, তা ও এতদিনে তো স্বীকার করতে বাধ্য হ'লো। হ'লো না কি? /3